রা মা য় ণ

রা মা য় ণ

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই আশ্বিন, ১৩৮২

২.৫০

নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জ
ও
চিত্রাঙ্কন
প্রশান্ত রায়

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ভূমিকা

ভারতের আদিকবি বাল্মীকি। কিন্তু আদিকবির রচনার সঙ্গে আমাদের পরম অপরিচয়। সংস্কৃত-চর্চা প্রায় লুপ্ত হয়েছে এ দেশ থেকে; সুতরাং, বাল্মীকিও যদি আবার বল্মীকস্তূপের মধ্যেই চিরবিলীন হয়ে যান, তবে আর বিচিত্র কি!

এ দেশে আজ যে শিক্ষানীতি অনুসৃত হচ্ছে, তা পাশ্চাত্ত্যের দান। পাশ্চাত্ত্যেও প্রাচীন ভাষাসমূহের চর্চা ক্রমেই কমে আসছে, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যিকদের সমাদর চলেছে বেড়ে। আর আদিকবিদের ত কথাই নেই। পাশ্চাত্ত্য তার প্রাচীন সাহিত্যিকদের স্মরণে রাখতে জানে—সম্মান দিতে জানে। তাই প্রাচীন গ্রন্থাবলীর নিত্য নব নব সংস্করণ বেরুচ্ছেও দেশে। বহু ক্ষেত্রেই ঐ সব আদিগ্রন্থের ভাষা বর্তমানে মৃত। তাই বর্তমানের জীবন্ত ভাষাগুলিতে ঐ সব গ্রন্থ অনূদিত হচ্ছে, তাদের কাহিনীসমূহ বিবৃত হচ্ছে নানা আকারে নানা ধরনে সর্বস্তরের পাঠকের জন্য।

আর আমরা?

আমরা আমাদের আদিকবিকে পর্যন্ত জিইয়ে রেখেছি কেবল—আমাদের পুঁথিশালা থেকে নির্বাসন দিয়েছি তাঁর গ্রন্থকে!

বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছেন: "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নইলে বাঙ্গালার ভরসা নাই।' এ কথা শুধু বাঙলাই নয়—সারা ভারতের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস, বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, প্রায় কিছুই নেই বললে চলে। যেটুকু আছে, তা আছে প্রধানতঃ প্রাচীন সাহিত্যে।

ইতিহাসের অর্থ কেবল রাজবাজড়ার নাম-তালিকা আর যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ নয়। সমাজ ও জনগণের জীবন-প্রবাহের গতি নির্ধারণই মুখ্য কর্তব্য। আর

তা যদি করতে হয়, তবে এ দেশের প্রাচীন সাহিত্যকে কিছু মাত্র উপেক্ষা করা চলবে না, কারণ ঐ সব সাহিত্যে উক্ত জীবন-প্রবাহ ফল্গুর মতই অন্তঃশীলা থেকেও সরাসরি সাড়া জাগায় আমাদের বুদ্ধিতে ও চেতনায়।

আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণে জনজীবনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার বর্ণ সুষমায় আজ কয়েক হাজার বছর পরেও আমাদের ভারতীয় সমাজ উদ্ভাসিত। বাল্মীকি-রামায়ণের রাম লক্ষ্মণ ভরত সীতা প্রভৃতি আদর্শ চরিত্রসমূহ আজও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়নি ভারত থেকে এই বণিকৃতন্ত্রী যুগেও!

রামচরিত্রের স্রষ্টা যদি পাশ্চাত্যে জন্মাতেন, তাহলে তাঁর মহাকাব্যের কত না সংস্করণ কত না অনুবাদ হত—কত না অনুগ্রন্থ তৈরী হত তাঁর গ্রন্থ থেকে। হোমারের পাশে বাল্মীকিকে পেলে পাশ্চাত্য বোধহয় স্বর্গরাজ্যের দাবিও ছেড়ে দিতে পারত। অথচ, ভারতবর্ষ ব্যাস ও বাল্মীকিকে একত্রে পেয়েও তেমন করে তাকাতে শিখল না তার অতীতের দিকে।

বাঙলাদেশে বাল্মীকির প্রকৃত প্রচার করেছেন কবিশ্রেষ্ঠ কৃত্তিবাস ওঝা। বাল্মীকির রামায়ণ থেকে তিনি যে অপূর্ব অনুকাব্য রচনা করেছেন, তারই মাধ্যমে অধিকাংশ বাঙালী ভারতের আদিকাব্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাল্মীকির অজ্ঞাত জীবনের একটি অতি কবিত্বময় অপূর্ব প্রসাদ-গুণসম্পন্ন কাহিনী রচনা করেছেন। কৃত্তিবাসের সৃষ্ট রত্নাকর-দস্যুকে বাদ দিয়ে আজ যেন আমরা বাল্মীকিকে স্মরণও করতে পারি না!

কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রভেদ বিস্তর। সত্য কথা বলতে কি, সূক্ষ্ম বিচার করলে দেখা যাবে যে কাল-প্রভাবে বাল্মীকির চরিত্রাবলী কৃত্তিবাসের হাতে পড়ে বহুক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বেশপরিবর্তন করেছে। সুতরাং, মূল বাল্মীকি-রামায়ণ পড়া প্রয়োজন।

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা বাল্মীকি-রামায়ণের কাহিনী জানুক, মূল আদিকাব্যখানি পড়ার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে উঠুক, ভারতের খাঁটি ঐতিহ্যকে মর্যাদা দিতে শিখুক তারা: বর্তমান গ্রন্থখানির এই হল উদ্দেশ্য। যথাসম্ভব

সহজবোধ্য ভাষাতেই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে। তবে, মহাকবির মূল কাহিনী ও সুরের সঙ্গে কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের পরিচিত করানর জন্য মাঝে মাঝে দু-একটি অপেক্ষাকৃত কঠিন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; এবং, কেবল সেই সব কঠিনতর শব্দাবলীই ব্যবহৃত হয়েছে, যাদের ঝঙ্কারে আকৃষ্ট হয়ে সেগুলিকে মনের মণিমন্দিরে সঞ্চিত করে রাখবে কোমলমতি পাঠকবর্গ। ইতি

বসিরহাট, শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

বালকাণ্ড

রামায়ণ-রচনার কাহিনী

দেবর্ষি নারদ। জ্ঞানে তপস্যায় পাণ্ডিত্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না সেকালে। তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা হল মহামুনি বাল্মীকির।

বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করলেন নারদকে: "কে এমন এখন আছেন পৃথিবীতে, যিনি গুণবান্ বীর্যবান্ ধর্মজ্ঞ সত্যবাদী ও কৃতজ্ঞ? কে তিনি, চরিত্র যাঁর নির্মল, সকল জীবের যিনি হিতসাধক, বিদ্যা যাঁর সমুদ্রের মত গভীর, যিনি কর্তব্যপরায়ণ, ক্রোধ ও অসূয়া যিনি দূর করেছেন মন থেকে, যাঁর আত্মসংযম আর রূপলাবণ্যের তুলনা নেই? কে তিনি, যাঁকে রণক্ষেত্রে রুষ্ট দেখলে দেবতাদেরও ভয় জাগে?"

নারদ উত্তর দিলেন: "মাত্র একজনই এমন আছেন পৃথিবীতে। তিনি হলেন অযোধ্যাপতি রাম। ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম তাঁর। যেমন তাঁর সংযম, তেমনি বীরত্ব। তাঁর আজানুলম্বিত বাহুতে অপরিমেয় শক্তি, শ্যামল দেহে অনুপম রূপলাবণ্য। সর্বশত্রুকে দমন করেছেন অরিন্দম রাম। অথচ, তিনি ধীরস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয়। অতুলন তাঁর বুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞান ও বাগ্মিতা। তিনি ধার্মিক সত্যসন্ধ ও প্রজানুরঞ্জন। সর্বগুণে গুণী তিনি।"

এই বলে নারদ অতি সংক্ষেপে রামের জীবন-কাহিনী শোনালেন বাল্মীকিকে।

নারদ চলে গেলে বাল্মীকি গেলেন তমসা-নদীতে স্নান করতে।

তমসার তীরে নিবিড় বন। অপরূপ সৌন্দর্য সে বনের। সারা বন জুড়ে সবুজ ঘাসের গালচে পাতা; তার উপরে আকাশ-ছোঁয়া স্তম্ভের মত বড় বড় গাছ, গাছগুলির শাখায় শাখায় নানা পাখির কূজন-কলরব; বনের ঊর্ধ্বে অনন্ত আকাশের চন্দ্রাতপ—খনে খনে রঙ্ ফেরে আকাশের, আর সেই সব বিচিত্র রঙের ছায়া খেলা করে তমসার জলে।

স্নানের কথা ভুলে গেলেন বাল্মীকি—মায়ামুগ্ধের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সেই বনে।

বনের মধ্যে মনের আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছিল দুটি ক্রৌঞ্চ—একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী। বাল্মীকি একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন ক্রৌঞ্চমিথুনকে। হঠাৎ এক ব্যাধ এসে তীর ছুড়ে বধ করল পুরুষ-ক্রৌঞ্চটিকে। তা দেখে ক্রৌঞ্চীটি করুণ সুরে রোদন করতে লাগল। সেই বিলাপ—সেই কান্নার শব্দ কাঁটার মত বিঁধল বাল্মীকির অন্তরে। আর্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি ঃ

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

—ওরে নিষাদ, মনের সুখে খেলে বেড়াচ্ছিল ক্রৌঞ্চ দুটি; তাদের একটিকে বধ করলি তুই; এই পাপে কোনদিন সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবি না তুই—চিরকাল পতিত হয়ে থাকতে হবে তোকে।

উক্তিটি করেই বিস্মিত হলেন মহামুনি। "একি! এ কি বললাম আমি!" ভাবতে লাগলেন তিনি ঃ "সুর ও তালের এমন সামঞ্জস্য কি করে ধ্বনিত হল আমার কণ্ঠে? এমনটি ত আর শুনিনি কখনও!"

শোক থেকে উৎপন্ন হল এ উক্তি, বাল্মীকি তাই এর নাম দিলেন ঃ শ্লোক।

চিন্তিত চিত্তে তমসার জলে স্নান করে আশ্রমে ফিরলেন

বাল্মীকি। আশ্রমে ফিরেও আপন মনে তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন শ্লোকটি।

এমন সময়ে বাল্মীকির আশ্রমে এলেন দেবাদিদেব ব্রহ্মা। তিনি আদেশ করলেন মুনিকে : ঐ শ্লোকের সুরে-তালে 'রামায়ণ' অর্থাৎ রামের জীবন-কাহিনী রচনা করতে।

বাল্মীকি বললেন : "আমি যে রামের জীবনকথা ভাল জানি না, প্রভু,—কি করে আদেশ পালন করব আপনার?"

ব্রহ্মা বললেন : "অজানা যা-কিছু, তা আপনা থেকেই জানতে পারবে তুমি; সুতরাং সহজেই রচনা করতে পারবে 'রামায়ণ'। এই রামায়ণ 'মহাকাব্য' বলে আখ্যাত হবে জগতে। এর কোন বাক্য মিথ্যা হবে না। পৃথিবীতে যত কাল গিরি-নদী থাকবে, তত কাল প্রচারিত থাকবে তোমার রামায়ণ-কথা।"

ব্রহ্মা বিদায় নিলেন। তাঁর আদেশে রামায়ণ রচনা করলেন ভারতের আদিকবি বাল্মীকি অনুষ্টুপ্-ছন্দে। এবার শোন সেই রামায়ণের কাহিনী।

দশরথের পুত্রলাভ

স্বচ্ছসলিলা সরযূ-নদী। তার তীরে কোশলরাজ্য। সমৃদ্ধির তুলনা নেই এ রাজ্যের, পরিমাপ নেই তার ধনরত্নের। এই বিস্তৃত জনপদের প্রতিটি প্রজার ঘরে আনন্দ-হিল্লোল।

কোশলের রাজধানী অযোধ্যা। স্বর্গের অমরাবতীর মতই শোভা তার। অযোধ্যার প্রশস্ত রাজপথগুলির দুধারে বড় বড় ছায়াতরু, অসংখ্য সুসজ্জিত বিপণি। নগরীর বিশাল কপাটে ও তোরণে বিস্ময়কর সব কারুকার্য। অযোধ্যা-রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার

যুদ্ধযন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। সুদৃশ্য ও সুউচ্চ অট্টালিকার সারিতে নগরীটি পরিশোভিত। নাট্যশালা, উদ্যান, দীঘি-সরোবর,—কিছুরই অভাব নেই কোশলের রাজধানীতে।

দেবরাজ ইন্দ্রের মত কোশলরাজ্য শাসন করছেন দশরথ। তাঁর শাসনগুণে প্রজারা সব নিত্যসুখী।

কিন্তু মনে সুখ নেই রাজা দশরথের। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। পরমাসুন্দরী তিন রানী তাঁর—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কিন্তু কারও সন্তান হয়নি এ পর্যন্ত।

অবশেষে পুত্রকামনায় অশ্বমেধ-যজ্ঞের আয়োজন করলেন দশরথ। অঙ্গদেশ থেকে মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গ-মুনিকে নিয়ে আসা হল যজ্ঞে পুরোহিত হবার জন্য। এল শত শত স্থপতি ও খনক; সরযূ-নদীর উত্তর তীরে বিশাল এক যজ্ঞশালা নির্মাণ করল তারা, আর নির্মাণ করল অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য বিশাল বিশাল বাসভবন।

তারপর একদিন বসন্তকালে সুলক্ষণ একটি অশ্বকে যজ্ঞের বলিরূপে উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া হল। অশ্বমেধ-যজ্ঞের নিয়মানু-সারে ঘোড়াটি একবছর ধরে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াল দেশবিদেশে। পরের বছর আবার বসন্তকালে সেটিকে ফিরিয়ে আনা হল অযোধ্যায়। তখন যজ্ঞ নিষ্পন্ন করে ঘোড়াটিকে বলি দেওয়া হল।

এবার দশরথের পুত্র-কামনায় পুত্রীয়েষ্টি-যজ্ঞ আরম্ভ করলেন ঋষ্যশৃঙ্গ।

এই সময়ে লঙ্কায় রাজত্ব করছিল রাবণ নামে এক দুর্দান্ত রাক্ষস। কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করে সে বর চেয়েছিল: দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস যেন বধ না করতে পারে তাকে। অবজ্ঞাভরে মানুষের নাম সে করেনি, কারণ মানুষ ত তার খাদ্য।

ব্রহ্মা বলেছিলেন ঃ "তথাস্তু"— তাই হোক।

ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হয়ে অদম্য হয়ে উঠল রাবণ। স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে বিষম অত্যাচার করে বেড়াতে লাগল সে। দেবতারা পর্যন্ত তার প্রতাপে থরহরি কম্পমান হতে লাগলেন রাত্রি-দিন।

তখন একদিন দেবতারা মিলে ভগবান্ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বললেন ঃ "ভয় নেই তোমাদের। বর চাইবার সময়ে রাবণ অবজ্ঞাভরে যে মানুষের নাম করেনি, সেই মানুষই বধ করবে তাকে।"

এমন সময়ে শঙ্খচক্রগদাপাণি ভগবান্ বিষ্ণু এলেন সেখানে। দেবতারা স্তব করে বললেন তাঁকে ঃ "দেবাদিদেব, রাবণের দাপটে অস্থির হয়ে উঠেছি আমরা। মানুষ ছাড়া অন্য কেউ বধ করতে পারবে না তাকে। মিনতি করি ঃ আপনি চার অংশে বিভক্ত হয়ে রাজা দশরথের তিন রানীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুন। তারপর বিনাশ করুন রাবণকে।"

দেবতাদের অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হলেন বিষ্ণু।

এদিকে পুত্রীয়েষ্টি-যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। অমনি যজ্ঞাগ্নি থেকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রক্তমুখ রক্তবসনধারী বিরাট্‌কায় এক জ্যোতির্ময় পুরুষ উঠে এলেন। হাতে তাঁর দিব্য পায়সে পূর্ণ একটি পাত্র। দশরথকে পাত্রটি দিয়ে তিনি বললেন ঃ "মহারাজ, এই পায়স আপনার রানীদের খেতে দিন। তাহলেই পুত্রবতী হবেন তাঁরা।"

দিব্য পুরুষ অন্তর্ধান করলেন। দশরথ পায়স নিয়ে সানন্দচিত্তে অন্তঃপুরে গেলেন। তিন রানী সেই পায়স খেলেন।

এর এক বছর পরে বড় রানী কৌশল্যার একটি ছেলে হল। তার নাম রাখা হল ঃ রাম। কিছু দিন পরে কৈকেয়ীরও একটি ছেলে হল। তার নাম হল ঃ ভরত। আরও কিছু দিন পরে সুমিত্রার হল দুটি ছেলে—লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

এই ভাবে রাবণ-বধের জন্য ভগবান্ বিষ্ণু চার অংশে ভাগ হয়ে দশরথের চার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হলেন পৃথিবীতে।

তাড়কাবধ ও মারীচাদির দমন

অযোধ্যার চার রাজকুমার বড় হয়ে উঠলেন দিনে দিনে। তাঁরা যেমন রূপবান্ তেমনি গুণবান্, যেমনি বিদ্বান্ তেমনি জ্ঞানবান্, যেমনি বীর তেমনি পরোপকারী। প্রজাদের নয়নের মণি হয়ে উঠলেন তাঁরা। আর রাম ত সকলের প্রাণ! অসামান্য তাঁর তেজস্বিতা ও পরাক্রম, চরিত্র তাঁর নির্মল চন্দ্রের মত মনোহর।

প্রগাঢ় ভালবাসা চার ভাইয়ে। বিশেষ করে, রামে ও লক্ষ্মণে এবং ভরতে ও শত্রুঘ্নে অপূর্ব স্নেহবন্ধন গড়ে উঠল। এক দিকে রাম-লক্ষ্মণ যেমন পরস্পরকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারতেন না, অপর দিকে তেমনি ভরত ও শত্রুঘ্ন ফিরতেন পরস্পরের ছায়ার মত।

ক্রমে বিয়ের বয়স হল কুমারদের। এমন সময়ে মহামুনি বিশ্বামিত্র এসে উপস্থিত হলেন দশরথের রাজসভায়।

মুনিকে অভ্যর্থনা করে রাজা দশরথ বললেন ঃ "আজ কি সৌভাগ্য আমার! আপনার মত মহামুনির পায়ের ধুলো পড়ল আমার রাজসভায়। বলুন, আপনার আদেশ কি? আমি সানন্দে পালন করব তা।"

বিশ্বামিত্র বললেন ঃ "মহারাজ, আমার যজ্ঞে বিষম বিঘ্ন ঘটাচ্ছে

মারীচ ও সুবাহু নামে দুই রাক্ষস। তারা যজ্ঞের সময়ে যজ্ঞবেদীর উপরে মাংস ও রক্ত বর্ষণ করে যজ্ঞ পণ্ড করে দেয়। যজ্ঞের সময়ে কাউকে অভিশাপ দেওয়া নিষিদ্ধ, তাই তাদের দমন করতে পারছি না আমি। আপনি রামকে আমার সঙ্গে দিন—তিনি বধ করবেন রাক্ষসদের।"

বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা শুনে মুহূর্তকাল অচেতনপ্রায় হয়ে রইলেন দশরথ। কি বলছেন মুনি—কিশোর রামকে নিয়ে যেতে চান দুর্দান্ত রাক্ষসদের বধ করতে!

সকাতরে বললেন দশরথ: "মুনিবর, রামের বয়স যে এখনও ষোল হয়নি। সে কি করে যুদ্ধ করবে মায়াবী রাক্ষসদের সঙ্গে? একান্তই যদি তাকে নিতে চান, তবে তার সঙ্গে আমাকেও সসৈন্যে নিন।"

দশরথের কথা শুনে বিষম ক্রুদ্ধ হলেন বিশ্বামিত্র, বললেন: "রাজা, আমার প্রার্থনা পূরণ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তুমি। এখন তা ভঙ্গ করলে। বেশ, আমি যেমন এসেছি, তেমনি ফিরে যাচ্ছি। তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে সুখে থেকো।"

বিশ্বামিত্রের ক্রোধ দেখে ভীত হলেন সবাই। কে জানে, হয়ত মুনির শাপে সবংশে ধ্বংস হবেন দশরথ। তখন রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ বিধিমতে বোঝালেন রাজাকে। তাঁর উপদেশে দশরথ রামকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যেতে দিলেন। লক্ষ্মণও তাঁদের সঙ্গে চললেন।

রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে পথ চলছেন বিশ্বামিত্র। বেশ কিছু দূর গিয়ে রামকে তিনি 'বলা' ও 'অতিবলা' নামে দুটি মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন, বললেন: "এ মন্ত্র দুটির প্রভাবে তোমার শ্রম বা জ্বর হবে

না কখনও—রূপও চিরদিন অটুট থাকবে। রাক্ষসরা তোমাকে ধর্ষণ করতে পারবে না। সৌভাগ্যে জ্ঞানে ও দক্ষতায় তোমার সমান হবে না কেউ। এ মন্ত্র দুটি আবৃত্তি করামাত্র ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হবে তোমার।"

পরদিন নৌকায় চড়ে সরযূ-নদী পার হয়ে এক ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করলেন বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণ। বিশ্বামিত্র বললেন: "পূর্বে এখানে বিশাল দুটি রাজ্য ছিল। রাক্ষসী তাড়কা ও তার ছেলে মারীচের অত্যাচারে আজ এই মহারণ্যে পরিণত হয়েছে জনপদ দুটি। সহস্র হস্তিনীর বল ধরে রাক্ষসী তাড়কা; তুমি তাকে বধ কর, রাম,—স্ত্রীলোক বলে ক্ষমা করো না যেন।"

এ কথা শুনে ঘোর রবে ধনুঃতে টঙ্কার দিলেন রাম। অমনি ভীষণদর্শনা তাড়কা মহারোষে আক্রমণ করল রাম-লক্ষ্মণকে। মস্ত মস্ত পাথরের চাঁই ছুড়ে মারতে লাগল সে। তবু স্ত্রীলোক বলে তার প্রতি করুণা হল রামের। তিনি রাক্ষসীকে প্রাণে না মেরে বাণ ছুড়ে তার হাত দুখানি কেটে দিলেন শুধু, আর লক্ষ্মণ কেটে দিলেন তার নাক-কান।

এতে আরও খেপে গেল রাক্ষসী। পাথর ছুড়ে ছুড়ে চতুর্দিক্ অন্ধকার করে তুলল সে। তখন বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম তীর ছুড়ে বধ করলেন তাড়কাকে।

সেদিন সেই বনেই রাত কাটালেন বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণ। পরদিন প্রভাতে বিশ্বামিত্র রামকে কতকগুলি অসাধারণ অস্ত্র দিলেন। তারপর তিনজনে গেলেন বিশ্বামিত্রের আশ্রমে।

পরদিন ঊষাকালে যজ্ঞে বসলেন বিশ্বামিত্র। ছ'দিন ধরে মৌনী হয়ে ক্রমাগত যজ্ঞ করতে লাগলেন তিনি, আর রাম-লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে সমানে জেগে পাহারা দিতে লাগলেন তাঁর আশ্রম।
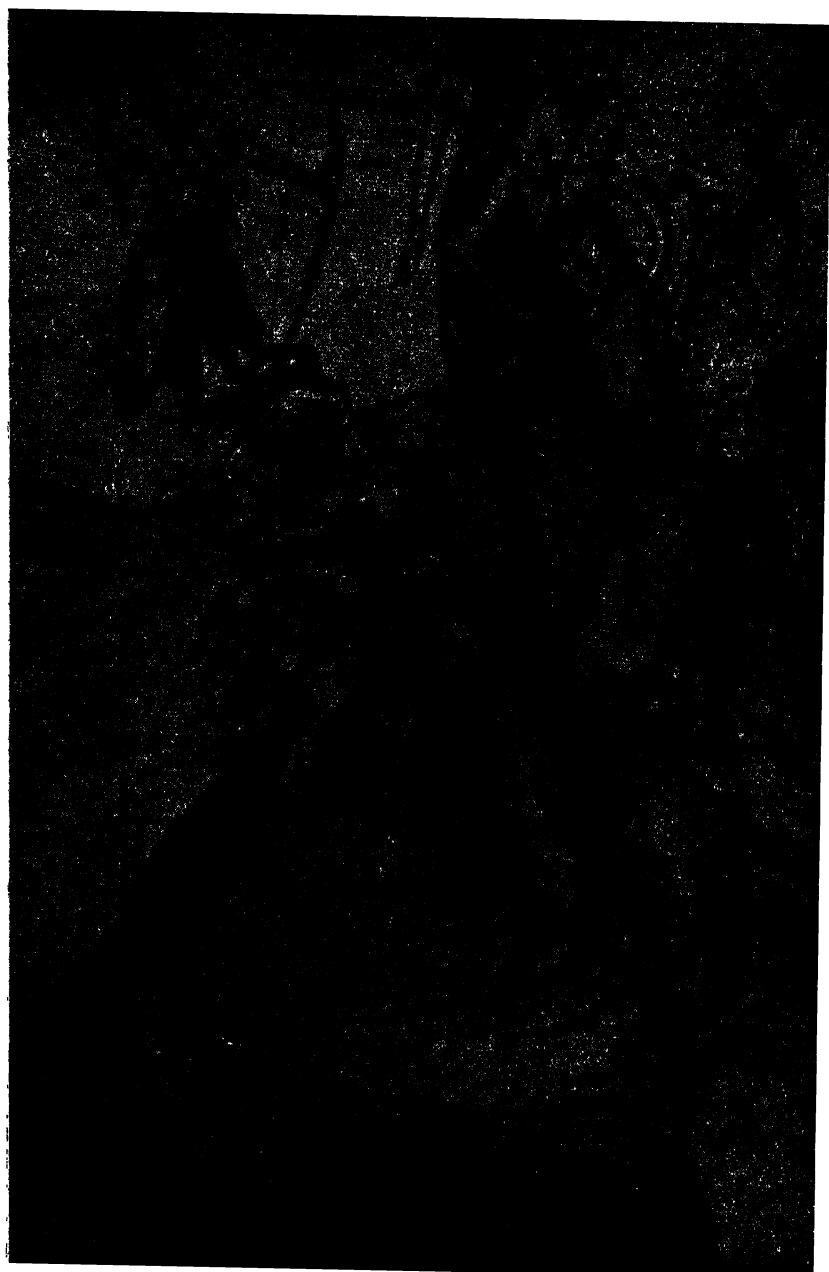
যজ্ঞের ষষ্ঠ দিনে রাক্ষস মারীচ ও সুবাহু সদলে এসে রুধির বর্ষণ করতে লাগল যজ্ঞবেদীর উপরে। তা দেখে রাম মারীচকে এক বাণ মারলেন। বাণের আঘাতে মারীচ অচেতন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে পড়ল বহু দূরে মহাসমুদ্রের মধ্যে। রাম আরেক বাণে বধ করলেন সুবাহুকে, তৃতীয় বাণে তিনি সংহার করলেন অন্য সমস্ত রাক্ষসদের।

বিশ্বামিত্র তখন নির্বিঘ্নে যজ্ঞ শেষ করে ধন্যবাদ দিলেন রামকে।

গঙ্গাবতরণের কাহিনী

পরদিন আবার চলতে আরম্ভ করলেন তিনজনে। দু দিন পরে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে তাঁরা স্নান আহ্নিক ও ভোজন সমাধা করলেন। তারপর বিশ্বামিত্র পৃথিবীতে গঙ্গা-আনয়নের কাহিনী শোনালেন দু ভাইকে।

পুরাকালে অযোধ্যায় সগর নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল দুই রানী। বড় রানীর একটি মাত্র ছেলে—অসমঞ্জ, আর ছোট রানীর ছেলে হল ষাট হাজার।

ক্রমে বড় হলেন অসমঞ্জ। অংশুমান্ নামে একটি ছেলেও হল তাঁর। কিন্তু অসমঞ্জ এমনি দুর্বৃত্ত ও অত্যাচারী হয়ে উঠলেন যে সগররাজা তাঁকে নির্বাসিত করলেন অযোধ্যা থেকে।

এর পর অশ্বমেধ-যজ্ঞের আয়োজন করেন সগর। যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হল। দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসের রূপ ধরে চুরি করে নিয়ে গেলেন সেই ঘোড়া।

সগররাজার ষাট হাজার ছেলে ঘোড়ার খোঁজে বেরলেন। কিন্তু সারা পৃথিবী খুঁজেও ঘোড়াটিকে পেলেন না তাঁরা। অবশেষে তাঁরা

মাটি খুঁড়ে পাতালে গেলেন। সেখানে কপিলমুনির আশ্রমের কাছে ঘোড়াটিকে চরে বেড়াতে দেখলেন তাঁরা।

কপিলমুনিকেই অশ্বচোর ভেবে তাঁকে আক্রমণ করলেন সগর-নন্দনেরা। তাতে মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে এমন এক হুঙ্কার দিলেন যে সগরের ষাট হাজার ছেলে ভস্ম হয়ে গেলেন।

এদিকে ছেলেদের ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে সগররাজা তাঁর নাতি অংশুমান্‌কে পাঠালেন তাঁদের খোঁজে। অনেক খুঁজে অংশুমান্ কপিলমুনির আশ্রমে গিয়ে পিতৃব্যদের দুর্দশা দেখে মর্মাহত হলেন। মুনিশাপে মৃত্যু হলে লোকে স্বর্গে যেতে পারে না—এ কথা ভেবে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন তিনি। এমন সময়ে পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় এসে তাঁকে বললেন যে, হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গার জলে সগরতনয়দের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করলে তাঁদের স্বর্গলাভ হবে।

অংশুমান্ যজ্ঞাশ্ব নিয়ে ফিরে এসে পিতামহ সগরকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনার জন্য বহু চেষ্টা করলেন সগর, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হলেন না। শেষ পর্যন্ত ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলেন তিনি।

সগরের পর রাজা হলেন অংশুমান্, তারপর অংশুমানের ছেলে দিলীপ। কিন্তু তাঁরাও গঙ্গাকে আনতে পারলেন না পৃথিবীতে।

দিলীপের পর রাজা হলেন তাঁর ছেলে ভগীরথ। তিনি মন্ত্রীদের উপর রাজ্যচালনার ভার দিয়ে গেলেন গোকর্ণ-প্রদেশে; সেখানে পৃথিবীতে গঙ্গাবতরণের জন্য কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন তিনি।

ভগীরথের তপস্যায় প্রসন্ন হলেন ব্রহ্মা। তিনি ভগীরথকে দর্শন

দিয়ে বললেন ঃ "তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে, রাজা,—গঙ্গা নামবেন ভূতলে। কিন্তু তাঁর পতনের বেগে পৃথিবী চূর্ণ হয়ে যাবে যে! তাই, তুমি তপস্যা করে সন্তুষ্ট কর মহাদেবকে,—তিনি গঙ্গাকে ধারণ করলে তাঁর পতনের বেগ হ্রাস পাবে।"

ভগীরথ তপস্যা করে প্রসন্ন করলেন মহাদেবকে। মহাদেব গঙ্গার ধারাকে ধারণ করতে সম্মত হলেন। গঙ্গা তখন বিশাল আকারে ভীষণ বেগে শিবের মাথার উপরে পড়তে লাগলেন, তারপর শিবের জটা বেয়ে সপ্ত ধারায় ছড়িয়ে পড়লেন পৃথিবীর বুকে। ঐ ধারা সাতটির একটির নাম ঃ সিন্ধু। সেই ধারাটি ভগীরথের পিছনে-পিছনে বয়ে চলল।

রাজা ভগীরথ চলেছেন দিব্য রথে চড়ে, তাঁর পিছনে-পিছনে বয়ে চলেছে গঙ্গার স্রোত। পথে পড়ল জহ্নু মুনির আশ্রম। মুনি তখন যজ্ঞ করছিলেন। গঙ্গার প্রবল স্রোতে ভেসে গেল যজ্ঞস্থান। মুনি ক্রুদ্ধ হলেন, গণ্ডূষ করে পান করে ফেললেন গঙ্গার সমস্ত জল। তখন দেবতা গন্ধর্ব ও ঋষিরা মিলে স্তব করে শান্ত করলেন জহ্নুকে। জহ্নু প্রসন্ন হয়ে নিজের কর্ণরন্ধ্র দিয়ে বের করে দিলেন গঙ্গাকে। সেই থেকে গঙ্গার নাম হল ঃ জাহ্নবী অর্থাৎ জহ্নুর কন্যা।

আবার ভগীরথের অনুসরণ করতে লাগলেন গঙ্গা। শেষে তিনি সাগরে মিশে প্রবেশ করলেন পাতালে। সেখানে তাঁর স্পর্শে সগর-নন্দনেরা মুক্তি পেয়ে স্বর্গে গেলেন।

এমনি করে গঙ্গা নেমেছিলেন পৃথিবীতে। ভগীরথ তাঁকে মর্ত্যে এনেছিলেন বলে তাঁর আরেকটি নাম হল ঃ ভাগীরথী।

বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভের কাহিনী

পরদিন বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণ গঙ্গা পার হলেন। একদিন পরে তাঁরা পৌঁছলেন মিথিলায়।

মিথিলার এক নির্জন উপবনে মহামুনি গৌতমের আশ্রম। গৌতমের পত্নী অহল্যা একটি গুরুতর অপরাধ করে ফেলেন। তাতে মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দেন: "বহু বছর ধরে তোমাকে একা থাকতে হবে এই আশ্রমে। কেউ দেখতে পাবে না তোমাকে; শুধু বায়ু হবে তোমার খাদ্য, শয্যা হবে ভস্মস্তূপ। তবে দশরথের পুত্র রাম এ আশ্রমে এলে শাপমোচন হবে তোমার।" এই বলে গৌতম হিমালয় পর্বতে চলে গেলেন তপস্যা করতে।

রাম গৌতমের আশ্রমে প্রবেশ করলে শাপমুক্তা হলেন অহল্যা। তিনি বহু সমাদরে রাম-লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করলেন।

গৌতমের আশ্রম থেকে তিনজনে গেলেন মিথিলারাজ জনকের যজ্ঞস্থলে। জনকের পুরোহিত শতানন্দ হলেন অহল্যার জ্যেষ্ঠ পুত্র। জননীর শাপমুক্তিতে অত্যন্ত হৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। তিনি সযত্নে রাম-লক্ষ্মণের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন, তারপর বিশ্বামিত্রের সম্বন্ধে অপূর্ব কাহিনী শোনালেন রামকে।

শতানন্দ বললেন: বিশ্বামিত্র ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজা। একবার তিনি দেশ-পর্যটনে বের হলেন, সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা।

এ দেশ সে দেশ ঘুরে তিনি উপস্থিত হলেন বশিষ্ঠ-মুনির আশ্রমে। রাজা ও রাজবাহিনীর আহারের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলেন বশিষ্ঠ। পাছে মুনি অসুবিধায় পড়েন, তাই বিশ্বামিত্র সবিনয়ে আহারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেন। কিন্তু কিছুতেই ছাড়লেন না মুনি।

সুরভি নামে বশিষ্ঠের একটি গাভী ছিল। সেটি ছিল কামধেনু,—তার কাছে যা চাওয়া যেত, তাই পাওয়া যেত। বশিষ্ঠ গাভীটিকে বললেন ঃ "সুরভি, তুমি রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁর সৈন্যদের জন্য উত্তম আহারের ব্যবস্থা কর।"

অমনি অসংখ্য স্বর্ণপাত্র সৃষ্টি করল সুরভি। নানা রকম উপাদেয় খাদ্যে পূর্ণ সে পাত্রগুলি। রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁর সৈন্যদল ঐ সমস্ত দুর্লভ খাদ্য ভোজন করে পরম পরিতৃপ্ত হলেন।

সুরভির কীর্তিকলাপ দেখে তাকে পাবার জন্য ভারী আকাঙ্ক্ষা হল বিশ্বামিত্রের। বহু ধনরত্নের বিনিময়ে তিনি গাভীটিকে কিনে নিতে চাইলেন বশিষ্ঠের কাছ থেকে। কিন্তু কিছুতেই রাজী হলেন না বশিষ্ঠ। তখন বিশ্বামিত্রের আদেশে তাঁর ভৃত্যেরা সবলে টেনে নিয়ে চলল সুরভিকে।

সুরভি এক হেঁচ্‌কা টানে নিজেকে মুক্ত করে নিল রাজভৃত্যদের হাত থেকে। তারপর সে ছুটে এসে বশিষ্ঠের পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল ঃ "ভগবন, এই দুর্বৃত্ত ক্ষত্রিয় রাজার চেয়ে আপনিই অধিকতর শক্তিমান্‌, কারণ ক্ষত্রবলের চেয়ে ব্রহ্মবলই অধিক। অনুমতি দিন, আমি ব্রহ্মবলে এই দুরাত্মার দর্প বল ও অপচেষ্টা চূর্ণ করি।"

বশিষ্ঠ অনুমতি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাম্বারব করে উঠল সুরভি, আর তার দেহ থেকে বেরিয়ে এল অসংখ্য সৈন্য। তারা নিমেষের মধ্যে বিশ্বামিত্রের বাহিনীকে ধ্বংস করে ফেলল। তা দেখে বিশ্বামিত্রের এক শ ছেলে বশিষ্ঠকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু মুনির এক হুঙ্কারেই ভস্ম হয়ে গেলেন তাঁরা।

এতে বিষদাঁত-ভাঙা সাপের মত বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন বিশ্বামিত্র। তিনি তাঁর এক পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে গেলেন হিমালয়ে। সেখানে

তিনি কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে প্রসন্ন করে বর পেলেন যে, দেব দানব যক্ষ রক্ষ প্রভৃতি সবার অস্ত্র তাঁর আয়ত্ত হবে।

বর পেয়ে আবার এসে বশিষ্ঠের আশ্রম আক্রমণ করলেন বিশ্বামিত্র। কিন্তু বশিষ্ঠ তাঁর ব্রহ্মতেজের বলে আবার পরাস্ত করলেন তাঁকে।

তখন বিশ্বামিত্র বুঝতে পারলেন যে, ব্রহ্মবলের কাছে ক্ষত্রবল তুচ্ছ। তাই তিনি ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন আবার।

এই সময়ে রামেরই এক পূর্বপুরুষ রাজা ত্রিশঙ্কুর আকাঙ্ক্ষা হল: তিনি সশরীরে স্বর্গে যাবার জন্য যজ্ঞ করবেন। কিন্তু তাঁর পুরোহিত বশিষ্ঠ এ যজ্ঞ করতে রাজী হলেন না, বশিষ্ঠের ছেলেরাও রাজী হলেন না।

ত্রিশঙ্কু তখন গেলেন বিশ্বামিত্রের কাছে। বিশ্বামিত্র রাজী হলেন তাঁর যজ্ঞ করতে।

যজ্ঞ আরম্ভ করলেন বিশ্বামিত্র। যজ্ঞের প্রভাবে সশরীরে স্বর্গে গেলেন রাজা ত্রিশঙ্কু। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্য দেবতারা তাঁকে বললেন: "ফিরে যাও, ত্রিশঙ্কু, স্বর্গবাসের অধিকার তুমি পাওনি। মূর্খ, তুমি নিচের দিকে মাথা করে পৃথিবীতে পড় আবার।"

'ত্রাহি ত্রাহি'—বাঁচাও বাঁচাও, বলে চিৎকার করতে করতে অধঃশির হয়ে ত্রিশঙ্কু পড়তে লাগলেন পৃথিবীতে। এ দেখে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন: "তিষ্ঠ তিষ্ঠ"—থাম থাম। এই বলে তিনি নতুন এক স্বর্গ এবং নতুন সব দেবতা সৃষ্টি করতে লাগলেন।

দেবতারা তখন ভয় পেয়ে বিশ্বামিত্রকে এসে বললেন : "মুনিবর, আপনার মনোরথ পূর্ণ হবে। আপনি যে সব নতুন নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন, তাদের মধ্যে জ্যোতির্ময় রূপ ধরে দেবতুল্য হয়ে অবস্থান করবেন ত্রিশঙ্কু।"

একথা শুনে বিশ্বামিত্র শান্ত হলেন, তারপর পুষ্কর-তীর্থে গিয়ে ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য তপস্যা করতে লাগলেন।

কিছু দিন পরে অযোধ্যার রাজা অম্বরীষের যজ্ঞের পশু হরণ করেন দেবরাজ ইন্দ্র। পুরোহিত বললেন : যজ্ঞের পশু অপহৃত হওয়া গুরুতর দোষ ; এই দোষে অম্বরীষ বিনষ্ট হবেন ; সুতরাং, হয় তিনি পশুটিকে খুঁজে আনুন, নয়ত একটি মানুষকে বলি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করুন।

অনেক চেষ্টা করেও সন্ধান পাওয়া গেল না পশুটির। অম্বরীষ তখন ভৃগুতুঙ্গে গিয়ে লক্ষ ধেনুর বিনিময়ে ঋচীক-মুনির মধ্যম পুত্রকে কিনে আনলেন যজ্ঞে বলি দেবার জন্য। মুনিপুত্রটি বয়সে বালক, নাম শুনঃশেপ, বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয় তিনি।

শুনঃশেপকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরছিলেন অম্বরীষ। পথে পুষ্কর-তীর্থে মাতুল বিশ্বামিত্রকে দেখতে পেলেন শুনঃশেপ। তিনি বিশ্বামিত্রের কোলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে বললেন : "বাবা-মা নিষ্ঠুরের মত বেচে দিয়েছেন আমাকে। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। এমন উপায় করুন যাতে অম্বরীষের যজ্ঞও না পণ্ড হয় অথচ আমিও বাঁচতে পারি।"

বিশ্বামিত্র সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে দুটি দিব্য গাথা শিখিয়ে দিলেন শুনঃশেপকে।

অম্বরীষ যজ্ঞস্থানে ফিরে বলি দিতে উদ্যত হলেন শুনঃশেপকে।

শুনঃশেপ তখন বিশ্বামিত্রের শেখান গাথা দুটি গাইতে লাগলেন। সেই গাথা শুনে সন্তুষ্ট হলেন ইন্দ্র। তাঁর বরে শুনঃশেপ দীর্ঘজীবী হলেন, অম্বরীষও বহুগুণ যজ্ঞফল পেলেন।

এর পরেও বহু বছর ধরে তপস্যা করেন বিশ্বামিত্র। অবশেষে ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ব্রাহ্মণত্ব দিলেন। দেবতাদের অনুরোধে বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলে মেনে নিলেন এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন।

পরদিন প্রভাতে মিথিলারাজ জনক দেখা করলেন বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে।

রাজা জনক একদিন লাঙল দিচ্ছিলেন জমিতে। হঠাৎ তিনি দেখেন ঃ হলরেখার মধ্যে পরমাসুন্দরী একটি শিশুকন্যা। কন্যাটিকে জনক রাজপুরীতে নিয়ে এসে নিজের সন্তানের মত পালন করতে থাকেন। কন্যাটির নাম তিনি রাখেন ঃ সীতা, অর্থাৎ হলরেখা।

দিনে দিনে বড় হলেন সীতা। তাঁর বয়সও যত বাড়ে, রূপও বাড়ে তত। দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর রূপের খ্যাতি। ক্রমে বিয়ের বয়স হল তাঁর।

জনকের ঘরে ছিল দেবাদিদেব শিবের ধনুঃ। ধনুঃটি এমনি বিশাল এমনি ভারী ছিল যে, মানুষ ত ছার, দেব দানব গন্ধর্ব যক্ষ কোন প্রাণীরই সাধ্য ছিল না সেটি তুলতে। জনক ঘোষণা করলেন ঃ যিনি এই ধনুঃতে গুণ পরাতে পারবেন, তাঁরই সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে সীতার। ঘোষণা শুনে দেশবিদেশের বহু রাজা রাজপুত্র বীরপুরুষ

এলেন মিথিলায় হরধনুঃতে গুণ পরাতে; কিন্তু গুণ পরান দূরের কথা, ধনুঃটি নাড়তে পর্যন্ত পারলেন না কেউ! সুতরাং, সীতারও আর বিয়ে হয় না।

বিশ্বামিত্র রাজা জনককে বললেন ধনুঃটি সভায় আনতে। জনকের আদেশে পাঁচ হাজার বলিষ্ঠ লোক মিলে বহু কষ্টে আট চাকার একখানা গাড়ি টেনে আনল সভায়। সেই গাড়ির উপরে বিশাল এক লৌহসিন্দুক। ঐ সিন্দুকের মধ্যেই ছিল হরধনুঃ।

বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় রাম অনায়াসে তুলে নিলেন সেই ধনুক, তারপর তাতে গুণ পরিয়ে টান দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ধনুঃটি ভেঙে গেল। ধনুর্ভঙ্গের ফলে যে ভীষণ শব্দ হল, তাতে মনে হল ঃ বুঝি বা বজ্রপাত হল কোথাও, বুঝি বা খসে পড়ল বিশাল কোন পর্বতচূড়া!

রামের কীর্তি দেখে চমৎকৃত হলেন সভার লোক, চমৎকৃত হলেন জনক। বিস্ময়ের চেয়ে জনকের আনন্দ হল আরও বেশী, কারণ এতদিনে মিলল সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সীতার যোগ্য বর।

তখন জনক দূত পাঠালেন অযোধ্যায়। দূতের মুখে সমস্ত সংবাদ শুনে পরমানন্দিত হলেন রাজা দশরথ। তিনি রানীদের সঙ্গে নিয়ে ভরত-শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে চতুরঙ্গ সেনা সাজিয়ে গেলেন মিথিলায়।

এবার বিয়ের পালা। শুধু রামের নয়, অন্য তিন ভাইয়েরও বিয়ে হয়ে গেল। রামের সঙ্গে সীতার বিয়ে ত হলই; তাছাড়া, ঊর্মিলা নামে জনকের একটি মেয়ে ছিল, তাঁর সঙ্গে বিয়ে হল লক্ষ্মণের। আর, জনকরাজার ভাই কুশধ্বজের ছিল দুটি রূপবতী মেয়ে—মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি। ভরত বিয়ে করলেন মাণ্ডবীকে, আর শত্রুঘ্ন শ্রুতকীর্তিকে।

চার পুত্র ও চার পুত্রবধূকে নিয়ে মহানন্দে অযোধ্যায় ফিরে চলেছেন রাজা দশরথ। সহসা পথিমধ্যে জমদগ্নি-মুনির পুত্র পরশুরাম এসে তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ালেন। ভয়ঙ্কর মূর্তি পরশুরামের —মাথায় তাঁর মস্ত জটা, কাঁধে এক ভীষণ কুঠার, হাতে বিশাল ধনুর্বাণ ; বহুবার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করেছেন তিনি।

দশরথ ও তাঁর সঙ্গের লোকজন শঙ্কিত হলেন, ভয় হল : পরশুরাম আবার কি এলেন ক্ষত্রিয়-সংহার করতে ? তাঁরা বিধিমতে অভ্যর্থনা করলেন পরশুরামকে।

পরশুরাম রামকে বললেন : "রাম, শুনেছি তোমার বীরত্বের কথা, তোমার হরধনুর্ভঙ্গের সংবাদও পেয়েছি। আমার হাতে এই যে ধনুঃ দেখছ, এটি হল ভগবান্ বিষ্ণুর,—হরধনুঃর চেয়েও এটি শক্তিমান্। দেখি, তুমি কত বড় বীর—শর-যোজনা কর ত এই ধনুঃটিতে। যদি পার, তবে তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করব আমি।"

দশরথ ভয় পেলেন, মিনতি করলেন পরশুরামকে শান্ত হতে। কিন্তু পরশুরামের সেই এক কথা : শর-যোজনা কর এই বিষ্ণুধনুঃতে ; আর তা যদি পার, তবে তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করব আমি।

অগত্যা রাম শান্ত ভাবে পরশুরামের হাত থেকে বিষ্ণুধনুঃ নিয়ে অক্লেশে তাতে শর-যোজনা করলেন, তারপর বললেন : "আমার এই শর অব্যর্থ। কিন্তু আপনি পূজনীয় ব্রাহ্মণ, তাই প্রাণবধ করতে চাই না আপনার। এখন বলুন : এই শর নিক্ষেপ ক'রে আপনার গতিশক্তি নষ্ট করব, না নষ্ট করব আপনার তপোবল ?"

রামের অলৌকিক শক্তি দেখে ভয়ে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ হতবাক্ হয়ে রইলেন পরশুরাম, তারপর ধীর মৃদুকণ্ঠে মিনতি করে বললেন :

"আমার যথেচ্ছ ভ্রমণের শক্তি আছে, তুমি আমার সে শক্তি নষ্ট করো না রাম। বরং আমার তপোবল নষ্ট কর, বীর।"

রাম তখন বিষ্ণুধনুঃ থেকে তীর ছুড়ে পরশুরামের তপোবল নষ্ট করলেন, আর হতদম্ভ পরশুরাম চলে গেলেন মহেন্দ্রপর্বতে।

এর পর রাজা দশরথ পুত্র-পুত্রবধূদের নিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরলেন অযোধ্যায়। আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে তিন রানী বরণ করে ঘরে তুললেন চার পুত্রবধূকে।

অযোধ্যাকাণ্ড

মন্থরার কুমন্ত্রণা ও কৈকেয়ীর নির্বন্ধ

কয়েক বছর পরে শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে ভরত গেলেন মাতুলালয়ে কেকয়দেশে। রাম-লক্ষ্মণ পিতার কাছেই রইলেন। সর্বগুণাধার রাম হয়ে উঠলেন দশরথের নয়নের মণি—তাঁকে ছেড়ে একদণ্ডও বাঁচতে পারেন না রাজা।

একদিন দশরথ সভাসদ্‌দের বললেন: "বহুদিন ধরে আমি অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জের সেবা করে আসছি। এখন আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। এবার আমাকে বিশ্রাম দিন আপনারা। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রাম সর্বগুণে গুণী, দেবরাজ ইন্দ্রের মত শক্তিশালী সে। আপনারা অনুমতি দিলে তাঁকে যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করি।"

রাম ছিলেন অযোধ্যার প্রতিটি লোকের প্রাণসম প্রিয়। সুতরাং সকলেই সানন্দে সম্মত হলেন দশরথের প্রস্তাবে। তখন স্থির হল: আগামী কাল প্রভাতে অভিষেক হবে রামের।

আজ প্রভাতে রামের অভিষেক। সারা অযোধ্যা আনন্দে ভাসছে। রাস্তায়-ঘাটে, অট্টালিকাগুলির চূড়ায় চূড়ায়, দোকানে দোকানে, উঁচু গাছের মাথায় মাথায় উড়ছে নানা বর্ণের পতাকা। ভবনগুলির দুয়ারে দুয়ারে আম্রপল্লবে শোভিত মঙ্গল-কলস আর কদলীবৃক্ষ। রাজপথগুলি ধুইয়ে দেওয়া হয়েছে চন্দন-গোলা জলে, ঢেকে দেওয়া হয়েছে ফুলে-ফুলে। বর্ণে গন্ধে সুরে আনন্দে অযোধ্যা যেন আজ ইন্দ্রপুরী!

দাসী মন্থরা। দশরথের মেজ রানী কৈকেয়ীর বাপের বাড়ি থেকে সে এসেছিল অযোধ্যায় রানীর সঙ্গে। পিঠে তার মস্ত কুঁজ, মনটিতেও ভারী কূট। রাজপ্রাসাদের উপর থেকে অযোধ্যার আনন্দ-স্রোত দেখল সে, অবাক্ হয়ে ভাবল ঃ ব্যাপার কি ! সন্ধান নিতে সে শুনতে পেল রামের অভিষেকের কথা। অমনি হন্তদন্ত হয়ে সে চলল কৈকেয়ীর কাছে।

কৈকেয়ীকে গিয়ে বলল মন্থরা ঃ "বোকা মেয়ে, এখনও শুয়ে আছ ! এদিকে তোমার যে সর্বনাশ হতে চলল !"

কৈকেয়ী উৎকণ্ঠিতা হয়ে শয্যার উপরে উঠে বসলেন, জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কি ব্যাপার ? হয়েছে কি ?"

"যা হবার, তাই-ই হচ্ছে" বলল মন্থরা ঃ "ভেবেছ বুঝি রাজা দশরথ ভারী ভালবাসেন তোমাকে ? মোটেই না, মোটেই না। অত্যন্ত শঠ অত্যন্ত ছলনাময় এই রাজা দশরথ। ভরতকে তিনি মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন রামকে সিংহাসন দেবেন বলে। আজ রামের অভিষেক।"

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কৈকেয়ীর দেবীর মত সুন্দর মুখখানি। তিনি নিজের একখানা মূল্যবান্ অলঙ্কার মন্থরাকে উপহার দিয়ে বললেন ঃ "অতি সুসংবাদ দিলে তুমি, মন্থরা। রামে ও ভরতে কোন পার্থক্য দেখি না আমি। রাম যদি সিংহাসনে বসে, তবে সন্তুষ্টই হব।"

কুবুদ্ধি মন্থরা। সক্রোধে অলঙ্কারখানি ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল সে ঃ "মূর্খ তুমি। রাম রাজা হলে বড় রানী কৌশল্যা হবেন রাজমাতা ; তখন তুমি হবে কৌশল্যার দাসী, আর ভরত হবে রামের ভৃত্য।"

সুবুদ্ধি কৈকেয়ীর মন তবু টলে না। কিন্তু মন্থরা ক্রমাগত

কুমন্ত্রণা দিতে লাগল তাঁকে। অবশেষে কৈকেয়ীরও ধারণা হল ঃ ঠিকই বলছে মন্থরা।

ব্যস্! অমনি কৈকেয়ীর ফুলের মত মনের মধ্যে প্রবেশ করল মন্থরার কুমন্ত্রণার কীট। সেই কীট কুরে কুরে খেতে লাগল তাঁর মনের পাপড়িগুলি!

সেকালে বড় বড় লোকের বাড়িতে এমন একখানা ঘর থাকত, যে ঘরে রাগ বা দুঃখ হলে মেয়েরা গিয়ে একা পড়ে থাকতেন। সে ঘরের নাম ছিল ঃ ক্রোধাগার অর্থাৎ গোঁসাঘর।

কৈকেয়ী গিয়ে ঢুকলেন ক্রোধাগারে, খুলে ফেললেন তাঁর সমস্ত অলঙ্কার, লুটিয়ে পড়লেন ভূতলে।

কিছুক্ষণ পরে রামের অভিষেকের কথা কৈকেয়ীকে জানাবার জন্য মনের আনন্দে অন্তঃপুরে এলেন রাজা দশরথ; এসে শোনেন ঃ মেজ রানী ক্রোধাগারে ঢুকেছেন।

কৈকেয়ীকে বড় ভালবাসতেন দশরথ। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি ক্রোধাগারে গিয়ে ভূলুণ্ঠিতা কৈকেয়ীর গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন ঃ "কি হয়েছে তোমার, দেবী? বল, কেন রাগ করেছ তুমি? এখনি আমি তার প্রতিকার করব।"

কৈকেয়ী বললেন ঃ "মহারাজ, রাগ আমি করিনি। তবে একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছে আমার মনে। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর যে সে আশা পূরণ করবে, তবেই তা তোমাকে জানাব।"

দশরথ বললেন ঃ "এক রাম ছাড়া আর কাউকে তোমার মত ভালবাসি না আমি। সেই রামের নামে শপথ করে বলছি ঃ তুমি যা বলবে, তাই করব।"

কৈকেয়ী তখন বললেন ঃ "দেবাসুরের যুদ্ধের কথা মনে কর, মহারাজ। সে যুদ্ধে দেবতাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিলে তুমি।

অসুররা তোমাকে বধ করতে পারেনি বটে, কিন্তু আহত করেছিল গুরুতরভাবে। আমিই তখন রক্ষা করেছিলাম তোমাকে। তাতে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলে তুমি। এখন সেই বর দুটি চাচ্ছি। এক বরে রামের বদলে ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর, আরেক বরে রামকে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠাও দণ্ডকারণ্যে।"

কৈকেয়ীর নৃশংস দাবি শুনে হতচেতন হয়ে পড়লেন রাজা দশরথ। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি কত তিরস্কার করলেন কৈকেয়ীকে, কত বোঝালেন, কত না মিনতি করলেন, কিন্তু কিছুতেই মন গলল না সে নিষ্ঠুরার। অবশেষে দশরথ বললেন: "মূর্খ আমি, না জেনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি। এখন আমার চেতনা লোপ পাচ্ছে—আমি রামকে দেখতে ইচ্ছা করি।"

এদিকে অভিষেকের লগ্ন এগিয়ে এসেছে। রাজ-অমাত্য সুমন্ত্র তাই এলেন রাজান্তঃপুরে দশরথকে সভায় নিয়ে যাবার জন্য। কৈকেয়ী তাঁকে বললেন: "সুমন্ত্র, রামের অভিষেকের আনন্দে সারারাত জেগেছেন রাজা, এখন তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত। তুমি রামকে এখানে নিয়ে এস, মহারাজ তাকে আশীর্বাদ করতে চান।"

অভিষেকের নিয়মানুযায়ী রাম সীতার সঙ্গে নিজের ভবনে শুচি হয়ে শুচিবাস পরে উপবাস করে জেগে কাটিয়েছেন সারাদিন সারারাত। সূর্যোদয় হয়েছে ; প্রফুল্লচিত্তে অভিষেক-ক্রিয়ার প্রতীক্ষা করছেন তিনি। এমন সময়ে সুমন্ত্র গিয়ে তাঁকে নিয়ে এলেন রাজভবনের অন্তঃপুরে কৈকেয়ীর মহলে। লক্ষ্মণও এলেন তাঁদের সঙ্গে।

দশরথের কাছে গিয়ে রাম দেখলেন: রাজার মুখ ভারী বিষণ্ণ

ও শুষ্ক। রাম ভক্তিভরে প্রণাম করলেন দশরথ ও কৈকেয়ীকে। প্রিয়তম পুত্র রামকে দেখে দু চোখ ভরে জল এল দশরথের, কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ হয়ে গেল; কোন মতে 'রাম' শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তাছাড়া একটি কথাও আর বলতে পারলেন না।

রাম উদ্বিগ্ন হয়ে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "ব্যাপার কি?"

নির্লজ্জা কৈকেয়ী বললেনঃ "তোমার পিতা একটা কথা বলতে চান তোমাকে, কিন্তু তোমার ভয়ে বলতে পারছেন না। রাজার তুমি প্রিয়তম পুত্র, তাই অপ্রিয় কথা মুখে আসছে না তাঁর।"

রাম বললেনঃ "কি সে এমন কথা, মা? রাজা কেন মিথ্যে ভয় করছেন আমাকে?"

কৈকেয়ী বললেনঃ "রাজা আমাকে দুটি বর দিয়েছেন। কিন্তু তুমি সে বরদানে বাধা দিতে পার; তাহলে রাজা সত্যভ্রষ্ট হবেন। সুতরাং, রাজা তোমার পক্ষে শুভ বা অশুভ যাই বলবেন, তা যদি করতে সম্মত হও, তবেই আমি সব কথা তোমাকে বলতে পারি।"

রাম একটু ক্ষুণ্ণকণ্ঠেই বললেনঃ "আঃ, মা, এ কি বলছেন? নিজের প্রাণ দিয়েও আমি পিতার সব ইচ্ছা পূরণ করতে প্রস্তুত।"

কৈকেয়ী তখন বললেনঃ "শোন, রাম, বহুদিন আগে তোমার পিতা দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন আমাকে। আজ সেই বর দুটি আমি চেয়েছি। এক বরে তুমি চোদ্দ বছরের জন্য বনে যাবে, অন্য বরে তোমার পরিবর্তে ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে।"

এ কথা শুনে রাম প্রশান্ত মুখে বললেনঃ "বেশ কথা। এর জন্য পিতা দুঃখ পাচ্ছেন কেন? আমি যাব দণ্ডকারণ্যে বনবাসে। আপনি, মা, ভরতকে নিয়ে আসার জন্য তার মাতুলালয়ে দ্রুতগামী দূত পাঠান।"

নির্দয়া কৈকেয়ী—আর তর সয় না তাঁর! রামকে তিনি

বললেন ঃ "শীঘ্র বনযাত্রা কর তুমি। তুমি বনে না গেলে তোমার পিতা স্নান-ভোজন করতে পারছেন না।"

কৈকেয়ীর মনের কথা বুঝতে বেগ পেতে হল না রামের। তবু তিনি শান্তমুখেই বললেন ঃ "ভয় নেই, দেবী, মা-কৌশল্যা ও সীতাকে সব জানিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে আজই বনে যাব আমি।"

রামের কথা শুনে হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন রাজা দশরথ পিতা ও বিমাতাকে প্রণাম করে রাম প্রস্থান করলেন। লক্ষ্মণও তাঁর পিছনে-পিছনে চললেন, কিন্তু চোখ দুটো তাঁর রাগে জ্বলতে লাগল আগুনের মত।

রাম লক্ষ্মণ ও সীতার বনযাত্রা

পুত্র রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। তাই মনের আনন্দে পুত্রের হিতকামনায় ইষ্টদেবতার আরাধনা করছেন জননী কৌশল্যা। এমন সময়ে রাম-লক্ষ্মণ উপস্থিত হলেন সেখানে।

রামের মুখে সব কথা শুনে আকাশ ভেঙে পড়ল কৌশল্যার মাথায়। এ কি দুর্দৈব! বিনা মেঘে বজ্রপাত এ যেন!

বিলাপ করে বলতে লাগলেন কৌশল্যা ঃ "হে রাম, হে সুন্দর, পূর্ণিমার চাঁদের মত তোমার মুখখানি না দেখে কি করে থাকব আমি? এর চেয়ে আমার মরণও ভাল—এখনই মরতে চাই আমি। বৎসহারা হলে গাভীর যে দশা হয়, তোমার বিহনে সেই দশাই হবে আমার।"

কৌশল্যার বিলাপ শুনে আর ক্রোধ দমন করে রাখতে পারলেন না লক্ষ্মণ। "ভীমরতি হয়েছে রাজার। স্ত্রৈণ তিনি" বললেন লক্ষ্মণ; তারপর তিনি রামকে বললেন ঃ "যদি তাঁর ধর্মবুদ্ধি থাকত,

তবে কখনই তিনি আপনার মত দেবতুল্য পুত্রকে ত্যাগ করতেন না। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে আপনাকে সিংহাসনে বসাই। দেখি, কে বাধা দেয়? প্রয়োজন হলে, ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে সমস্ত অযোধ্যা বীরশূন্য করব আমি।"

বহু চেষ্টা করে লক্ষ্মণকে শান্ত করলেন রাম, কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিলেন, তারপর বললেন: "আমার এ বনগমনের জন্য দায়ী একমাত্র দৈব—আমার কর্মফল। তাই যদি না হবে, তবে কেন মাতা কৈকেয়ীর মত সৎস্বভাবা গুণবতী রাজপুত্রী এমন হিংসাপরায়ণা ক্ষুদ্রমনা গ্রাম্য নারীর মত আচরণ করবেন?"

আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন লক্ষ্মণ, বললেন: "ক্ষমা করবেন, দৈবে আমার আস্থা নেই। দুর্বলেরাই দৈবের দোহাই দেয়। আমাকে অনুমতি দিন, আপনাকে সিংহাসনে বসাই।"

মহামতি রাম অনেক বুঝিয়ে শান্ত করলেন কনিষ্ঠকে।

কৌশল্যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সীতার কাছে গেলেন রাম।

সব বৃত্তান্ত শুনে সীতা বললেন যে, তিনিও বনবাসিনী হবেন রামের সঙ্গে।

রাম বললেন: অরণ্যপথ বড় দুর্গম—কণ্টকে সমাকীর্ণ, হিংস্র প্রাণীরা রাত্রিদিন চরে বেড়ায় সে পথে, বহু দুঃখ অরণ্যে—বহু বিপদ্; সীতার সেখানে যাওয়া উচিত নয়।

সীতা বললেন: "আমি পতিব্রতা, তোমার সুখদুঃখের অংশভাগিনী আমি, তোমাকে ভক্তি করি। হয় আমাকে তোমার সঙ্গে বনে নিয়ে চল, নয়ত আমি আত্মহত্যা করব। তোমার সঙ্গে যদি বনে যাই আমি, তবে পথের কাঁটা তুলোর মত কোমল লাগবে

আমার। তুমি সঙ্গে থাকলেই আমার স্বর্গ, তুমি দূরে গেলে আমার নরক। আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গে বনে যাব।”

অতএব সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে সম্মত হলেন রাম।

রাম-সীতার আলাপ শুনে লক্ষ্মণও জিদ ধরলেন যে, তিনিও বনে যাবেন তাঁদের সঙ্গে। অনেক বুঝিয়েও তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না রাম।

তখন রাম-সীতা তাঁদের সমস্ত ধনসম্পদ্ বিলিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদের। তারপর রাজা দশরথের কাছ থেকে বিদায় নিতে চললেন তাঁরা। লক্ষ্মণও তাঁদের সঙ্গে গেলেন।

তা দেখে হাহাকার করে উঠল সারা অযোধ্যা। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল: “ভূতে পেয়েছে আমাদের রাজাকে, নইলে যে রামের পিছনে চতুরঙ্গ সেনা চলত, সেই রামের পিছনে কিনা আজ শুধু সীতা ও লক্ষ্মণ! যে সীতার মুখ আকাশের পাখি পর্যন্ত কোনদিন দেখেনি, সেই সীতা কিনা আজ প্রকাশ্য রাজপথে সকল লোকের চোখের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে চলেছেন! চল, ভাই, আমরাও সবাই ওঁদের সঙ্গে বনে যাই। বনের মধ্যে নতুন নগর বসাব আমরা। আর, আমাদের পরিত্যক্ত এ অযোধ্যা পরিণত হোক অরণ্যে; সেখানে পুত্র ও বান্ধবদের নিয়ে বাস করুন

রাম আসছেন দেখে দশরথ আসন ছেড়ে উঠে তাঁর দিকে যেতে উদ্যত হলেন, কিন্তু পারলেন না—মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন ঘরের মেজেতে। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা তাঁকে তুলে সযত্নে পালঙ্কে শোয়ালেন।

চেতনা ফিরে পেয়ে দশরথ বললেন: “রাম, আজ রাত্রিটির জন্য আমার কাছে থাক তুমি—বনে যেয়ো না।”

কিন্তু রাম সম্মত হলেন না, বললেন : "এতে সত্যভঙ্গ হবে। আপনি অধীর হবেন না, পিতা,—চোদ্দ বছর বনবাসের পর অযোধ্যায় ফিরে এসে আবার আপনার পাদবন্দনা করব আমি।"

তখন দশরথ রামকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবার অচেতন হয়ে পড়লেন। তা দেখে উপস্থিত সকলে হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন। জল এল না কেবল কৈকেয়ীর চোখে—রাক্ষসী কৈকেয়ী!

সংজ্ঞালাভ করে দশরথ রামের সঙ্গে উপযুক্ত সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র ও ধনসম্পদ্ দিতে বললেন সুমন্ত্রকে।

এ আদেশ শুনে কৈকেয়ী বললেন : "মহারাজ, সব ধনসম্পদ্ই যদি রামের সঙ্গে গেল, তবে আর এ রাজ্য নিয়ে ভরতের লাভ কি?"

রাম তখন বললেন : "না-না, কিছুই নেব না আমি আমার সঙ্গে। সমস্তই ভরতের জন্য থাক, কেবল বনবাসীর উপযুক্ত সামান্য বস্ত্র দিন আমাদের।"

কৈকেয়ী আগে থেকেই তেমন বস্ত্র সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। রামের কথা শোনামাত্র তিনি তা এনে দিলেন। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা রাজবেশ ত্যাগ করে সেই চীরবাস পরলেন।

বনে যাবার জন্য রথে উঠলেন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা। সুমন্ত্র সে রথের সারথি।

সমস্ত অযোধ্যার লোক ছুটে এল, ছুটে এলেন দশরথ ও কৌশল্যা; সবাই ছুটতে লাগলেন রথের পিছনে। তা দেখে রাম সুমন্ত্রকে আদেশ করলেন বেগে রথ চালাবার জন্য যাতে রথখানি শীঘ্রই লোকদের চোখের আড়ালে চলে যায়।

রাজা দশরথ আর রথের নাগাল ধরতে পারলেন না। রথচক্রের

ধূলিজাল যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ তিনি বিহ্বল হয়ে নির্নিমেষ নেত্রে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন। মন্ত্রীরা বন্ধুরা অনেক বুঝিয়ে ধরাধরি করে রাজভবনে নিয়ে গেলেন তাঁকে।

রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন এক নতুন দশরথ। এ যেন অযোধ্যার তেজস্বী বীর্যবান্ অস্ত্রকুশল মহারাজ দশরথ নন, ইনি নন সেই দশরথ যাঁর সাহায্য নিয়েছিলেন দেবতারা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে। এ যেন এক স্থবির সাধারণ বৃদ্ধ!

রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন দশরথ, প্রবেশ করলেন কৌশল্যার মহলে। রামহীন অযোধ্যা, রামহীন রাজপুরী, রামহীন দশরথের অন্তর। মাঝরাতে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন দশরথ: "আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, কৌশল্যা,—আমার দৃষ্টিশক্তি রামের সঙ্গে গেছে, আমার হাত ধর তুমি। হা রাম, এখনও ফিরে এল না সে!"

বিলাপ করেন রাজা দশরথ, বিলাপ করেন রানী কৌশল্যা। তাঁদের বিলাপের ধ্বনিতে আর্তনাদ করে ওঠে রাজভবনের দেওয়ালগুলি পর্যন্ত। আর, লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের জননী সুমিত্রা রাতদিন জেগে প্রবোধ দেন তাঁদের।

বনবাসের প্রথম কয়েকটি দিন

দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে রামের রথ। তবু বহু ভক্ত প্রজা তখনও রথের পশ্চাদ্ধাবন করছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন জ্ঞানী তেজস্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও আছেন। তাঁরা ছুটছেন, আর ছোটার বেগে মাথা কাঁপছে তাঁদের। ব্রাহ্মণদের কষ্ট দেখে ভারী দুঃখ হল রামের; তিনি লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে রথ থেকে নেমে পদব্রজে যেতে লাগলেন।

সেই দিন সন্ধ্যা হলে তমসা-নদীর তীরে সকলে বিশ্রাম নিলেন। বনবাসের সেই প্রথম রাত্রিতে তমসা-তীরে তৃণশয্যায় শুয়ে নিদ্রা গেলেন রাম ও সীতা ; আর, লক্ষ্মণ সারারাত জেগে রামের বিবিধ গুণের কথা শোনাতে লাগলেন সুমন্ত্রকে।

রাত ভোর না হতেই রামের নিদ্রাভঙ্গ হল। লক্ষ্মণকে তিনি বললেন : "দেখ, এই যে সব অযোধ্যাবাসী এসেছে আমাদের সঙ্গে, কিছুতেই এরা আমাদের ছেড়ে যাবে না। এখন এরা ঘুমচ্ছে। চল, আমরা এই ফাঁকে রথে চড়ে চলে যাই।"

সুমন্ত্র তখন রথ নিয়ে এলেন। তাতে চড়ে তমসা পার হলেন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা। এদিকে অযোধ্যার লোকেরা ঘুম থেকে জেগে উঠে তাঁদের না দেখতে পেয়ে মর্মাহত হল, তারপর ফিরে গেল অযোধ্যায়।

তমসা পেরিয়ে রথ গিয়ে পৌঁছল শৃঙ্গবেরপুরে।

শৃঙ্গবেরপুরের রাজা গুহ ছিলেন জাতিতে চণ্ডাল। তিনি ছিলেন রামের প্রিয়তম বন্ধু। রামের আগমন-বার্তা পেয়ে তিনি তাঁর পাত্রমিত্র নিয়ে বন্ধুকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেলেন। রামকে আলিঙ্গন করে নিষাদরাজ বললেন : "সখা রাম, এই বিশাল রাজ্য তোমারই। তুমি এ রাজ্য শাসন কর, আমি আজ্ঞাবহ হয়ে থাকব তোমার।"

রাম সাদরে আলিঙ্গন করলেন বন্ধুকে। রামের জন্য নানা উত্তম খাদ্য পানীয় ও শয্যা এনেছিলেন গুহ। কিন্তু রাম তা গ্রহণ করলেন না, বললেন : "বন্ধু গুহ, তুমি এখন আমাকে তাপস বলেই জেনো,— এখন তৃণ আমার শয্যা, চীর আমার বস্ত্র, ফলমূল আমার ভোজ্য।"

সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করে লক্ষ্মণের আনীত জল পান করলেন রাম ;

তারপর তিনি ও সীতা তৃণশয্যায় শয়ন করলেন। আর, লক্ষ্মণ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সারা রাত জেগে পাহারা দিতে লাগলেন তাঁদের।

তা দেখে গুহ লক্ষ্মণকে বললেন ঃ "রাজপুত্র, তোমার জন্য এই শয্যা প্রস্তুত আছে, এতে শুয়ে নিদ্রা যাও তুমি; আমি আমার অনুচরদের নিয়ে সারারাত পাহারা দেব রাম-সীতাকে।

লক্ষ্মণ বললেন ঃ "নিষাদরাজ, রাম-সীতাই যখন আজ ভূতলে শুয়েছেন, তখন আমারই বা কি প্রয়োজন শয্যায় আর নিদ্রায় ?"

লক্ষ্মণের কথার মধ্যে যে দুঃখের সুর ছিল, তাতে আরও মনোব্যথা বাড়ল নিষাদরাজের!

পরদিন প্রভাতে রামের আদেশে ভারাক্রান্ত মনে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন সুমন্ত্র।

তখন বটের আঠা মাথায় মেখে জটা বানালেন রাম-লক্ষ্মণ। তারপর সীতাকে নিয়ে নৌকায় চড়ে গঙ্গা পার হলেন তাঁরা।

পরদিন সন্ধ্যায় তাঁরা পৌঁছলেন প্রয়াগ-তীর্থে ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে। সে রাত্রি তাঁরা মুনির আশ্রমেই কাটালেন। ভোরবেলা ভরদ্বাজের পরামর্শমত চিত্রকূট-পর্বতের অভিমুখে যাত্রা করলেন তিনজনে।

পরের দিন প্রভাতে পথ চলতে চলতে রাম সহসা বলে উঠলেন ঃ "ঐ দেখ চিত্রকূট-পাহাড়। বন কি সুন্দর এখানে! শীত শেষ হয়েছে, তাই গাছগুলি ভরে উঠেছে ফলেফুলে। ফুলের রূপে আলো হয়েছে সারা বন। ডাকপাখি ডাকছে, ডাকছে ময়ূর, ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে বনতল। এমন সুন্দর বনে কে না চাইবে বাস করতে ?"

বনের মধ্যে সুন্দর একখানা কুটির নির্মাণ করলেন লক্ষ্মণ। সেই বিশাল চিত্রকূট-পর্বতের পাদদেশে, সেই মনোহর অরণ্যে, মাল্যবতী-নদীর তীরে সেই পর্ণকুটিরে সুখে বাস করতে লাগলেন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা। রাজ্য হারানর কোন দুঃখই রইল না তাঁদের মনে!

দশরথের মৃত্যু

রামহীন অযোধ্যা। আনন্দ নেই, উৎসব নেই, কোলাহল নেই, নেই শোভা, নেই শ্রী। অযোধ্যার মানুষ আর গান গায় না, দীপ জ্বালায় না, ফুলে-পাতায় সাজায় না তাদের ভবনগুলি। তাদের মুখে আর হাসি নেই, আছে কেবল চোখে জল। সেই জল তাদের গাল বেয়ে নামে, ভিজিয়ে দেয় তাদের বুক, তারপর মিশে যায় মাটিতে। তমসায় যত না জল, তারও চেয়ে বুঝি বেশী জল আজ অযোধ্যার লোকের চোখে!

সেই নিরানন্দ অযোধ্যায় ফিরে এলেন সুমন্ত্র। তাঁকে দেখে ছুটে এল সারা রাজ্যের লোক। সবার মুখেই আকুল প্রশ্ন: বল, রামের সংবাদ বল।

তাদের কোনমতে শান্ত করে রাজভবনে প্রবেশ করলেন সুমন্ত্র। তাঁকে দেখে হাহাকার করে উঠলেন রাজা দশরথ, মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সুমিত্রা ও কৌশল্যা বহু কষ্টে চেতনা সম্পাদন করলেন তাঁর।

কাতর কণ্ঠে রাজা দশরথ রামের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করলেন সুমন্ত্রকে। যতই তিনি রামের কথা শোনেন, ততই অধীর হয়ে পড়েন। সুমন্ত্র তাঁকে বহু প্রবোধ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর পুত্রশোকাতুর হৃদয় শান্ত হল না।

রাম বনে যাবার পর ছ দিনের দিন মাঝরাতে দশরথ কৌশল্যাকে বললেন: "কল্যাণী, বহু পুরনো একটা ঘটনা আজ আমার মনে পড়েছে। সেদিন যে পাপ করেছিলাম, আজ বোধহয় তারই শাস্তি পেতে চলেছি।" এই বলে ঘটনাটি শোনালেন দশরথ।

দশরথের তখন বিয়ে হয়নি, অযোধ্যার তিনি যুবরাজ। সেই সময়ে শব্দ শুনেই তীর ছুড়তে পারতেন তিনি, আর ঠিক লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে বিঁধত সে তীর। এজন্য লোক তাঁকে বলত: শব্দভেদী।

একদিন রাত্রে দশরথ মৃগয়া করতে যান সরযূ-নদীর তীরে বনে। দূর থেকে অন্ধকারের মধ্যে তিনি সরযূর জলে একটা শব্দ শুনতে পেলেন, ভাবলেন: কোন হাতি বোধহয় জলপান করছে। সেই শব্দ লক্ষ্য করে তীর ছুড়লেন তিনি; সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যকণ্ঠের একটা তীব্র আর্তনাদ উঠল।

দশরথ ছুটে গিয়ে দেখেন: এক মুনিকুমার তীরবিদ্ধ হয়ে ছট্‌ফট্‌ করছেন, আর তাঁর পাশে ভূমিতে পড়ে আছে একটি কলসী। ঐ কলসীতে জল ভরছিলেন মুনিকুমার। সেই জল ভরার শব্দ শুনে দশরথ ভেবেছিলেন: কোন হাতি জল খাচ্ছে সরযূতে। ফলে, তিনি তীর ছোড়েন, এবং সেই তীর বিঁধে মরতে বসেছেন মুনিকুমার।

মুনিকুমারের কাছে সখেদে ক্ষমা চাইলেন দশরথ। মুনিকুমার বললেন যে, তাঁর মাতাপিতা দুজনেই অন্ধ, এই বনেই থাকেন তাঁরা; তিনি তাঁদের একমাত্র সন্তান; সুতরাং, তাঁর মৃত্যু হলে ভারী কষ্ট হবে অন্ধ তপস্বী-তপস্বিনীর।

এ কথায় আরও মর্মাহত হলেন দশরথ। মুনিকুমারের অনুরোধে তাঁর দেহ থেকে তীরটি তুলে ফেললেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল মুনিকুমারের। দশরথ তখন বিষণ্ণচিত্তে নিজে কলসীতে জল ভরে নিয়ে অন্ধ মুনি-দম্পতির কাছে গিয়ে সব কথা বললেন।

হাহাকার করে বিলাপ করতে লাগলেন মুনি-দম্পতি। দশরথ তাঁদের সরযূ-তীরে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁরা মৃত পুত্রের জন্য তর্পণ করে নিজেরাও জ্বলন্ত চিতায় উঠে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। চিতায় আরোহণের আগে অন্ধমুনি এই অভিশাপ দিলেন দশরথকে ঃ "নিষ্ঠুর, তুমি যেমন আমাকে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য করালে, তুমিও তেমনি পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করবে।"

কৌশল্যাকে কাহিনীটি শুনিয়ে দশরথ বললেন ঃ "মনে হচ্ছে, সেই অভিশাপ ফলবার দিন এসেছে আজ।"

দশরথের কথাই ঠিক হল—সেই রাত্রেই মারা গেলেন তিনি। রাজপুরীর সবাই তখন নিদ্রামগ্ন।

পরদিন প্রভাতে রাজাকে মৃত দেখে নতুন করে হাহাকার জাগল রাজভবনে, আরও মুহ্যমান হয়ে পড়ল অযোধ্যাবাসী।

রাজপুত্রেরা কেউ উপস্থিত নেই, সুতরাং কে করবে রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া? মন্ত্রীরা তাই রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের আদেশমত দশরথের মৃতদেহ একটি তৈলপূর্ণ আধারে রেখে দিলেন, যাতে না সে দেহ নষ্ট হয়; তারপর তাঁরা দ্রুতগামী দূত পাঠালেন ভরতকে তাঁর মামার বাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্য।

মন্থরার নির্যাতন

মাতুলালয়ে শত্রুঘ্নের সঙ্গে পরম সুখে আছেন ভরত। সহসা একদিন রাত্রে অতি উৎকট সব স্বপ্ন দেখলেন তিনি, দেখলেন ঃ রাজা দশরথ যেন পর্বতচূড়া থেকে গোবরে ভর্তি এক হ্রদের মধ্যে পড়ে ভাসছেন, আর অঞ্জলি করে তৈলপান করছেন; ভরত দেখলেন ঃ

সাগর শুকিয়ে গেছে, চাঁদ খসে পড়েছে, পৃথিবী আঁধারে ছেয়ে গেছে, আর দশরথের পরনে কাল কাপড়—স্ত্রীলোকেরা প্রহার করছে তাঁকে।

পরপর এমনি সব দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন ভরত। দুশ্চিন্তায় তাঁর আর ঘুম হল না, তাঁর ভয় হল: বোধহয় মৃত্যু ঘটেছে রাজা দশরথের।

এমন সময়ে অযোধ্যার দূত এসে উপস্থিত হলেন ভরতের কাছে। ভরত উৎকণ্ঠিত হয়ে মাতাপিতা ও ভ্রাতাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। দূত ঘুরিয়ে জবাব দিলেন: "কুমার, আপনি যাঁদের কুশল চান, তাঁরা কুশলে আছেন। লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ আপনি, লক্ষ্মী আপনার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন।"

মাতামহের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শত্রুঘ্নের সঙ্গে রথে আরোহণ করলেন ভরত। সাতদিন সাতরাত্রি ধরে ক্রমাগত বেগে রথ চালিয়ে তাঁরা এসে পেঁাছলেন অযোধ্যায়।

অযোধ্যার নিরানন্দ মূর্তি দেখে উদ্বিগ্ন ভরত আরও উদ্বিগ্ন হলেন। দ্রুতপদে রাজভবনে প্রবেশ করে প্রথমেই তিনি গেলেন দশরথের ঘরে। সেখানে রাজাকে না দেখতে পেয়ে তিনি কৈকেয়ীর মহলে গেলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন পিতার সংবাদ।

কৈকেয়ী বললেন: "সর্ব প্রাণীর শেষ গতি যা, তোমার পিতাও সেই গতি লাভ করেছেন—মৃত্যু হয়েছে তাঁর।"

সংবাদ শুনে ভরত হাহাকার করে লুটিয়ে পড়লেন ভূতলে। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে কৈকেয়ীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "কোন্ ব্যাধিতে মৃত্যু হল পিতার? আমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম কোথায়? তাঁকে আমার আগমন-সংবাদ দাও,—আমি প্রণাম করতে চাই তাঁকে।"

কৈকেয়ী তখন রামের বনগমন-বৃত্তান্ত খুলে বললেন ভরতকে : ভাবলেন ঃ ভরত শুনে খুশী হবেন।

সব শুনে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন ভরত, তারপর শোকে অধীর হয়ে বললেন কৈকেয়ীকে ঃ "হতভাগ্য আমি! পিতা ও পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হারিয়ে কি করব আমি এ রাজ্য নিয়ে? তুমি পরম পাপিষ্ঠা; রাম তোমাকে নিজের মায়ের মত দেখেন, নচেৎ এখনি ত্যাগ করতাম তোমাকে। আমি কখনই এ রাজ্য নেব না—রামকে ফিরিয়ে আনব অযোধ্যায়, দাস হয়ে থাকব তাঁর। রাক্ষসি, তুমি তোমার পিতৃকুলকে কলঙ্কিত করেছ, ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছ আমার পিতৃকুলকে।"

এই বলে কক্ষতলে পড়ে বালকের ন্যায় বিলাপ করতে লাগলেন ভরত, তারপর শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন কৌশল্যার সঙ্গে দেখা করতে।

কৌশল্যাকে সরোদনে আলিঙ্গন করলেন দুই ভাই। শোক-সন্তপ্তা কৌশল্যা বললেন ঃ "ভরত, তুমি যা চেয়েছ তাই পেয়েছ—পেয়েছ নিষ্কণ্টক রাজ্য। এখন আমাকে আর সুমিত্রাকে রামের কাছে বনে পাঠিয়ে দাও।"

এ কথায় ভরতের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল। যন্ত্রণায় অধীর হলেন তিনি, রাম-জননীর পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ "আমি ত এ সবের কিছু জানি না, মা। আপনি ত জানেন, রামকে কত ভালবাসি আমি। যদি আমি কিছুমাত্র রামের বনবাস কামনা করে থাকি, তবে যেন চরম দুর্গতি হয় আমার।"

ভরতের কথা শুনে তাঁকে কোলে নিয়ে বসলেন কৌশল্যা, কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ "বাবা, তোমার কথায় দুঃখ আমার আরও বাড়ল!"

ভরত যথাবিহিত পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে দ্বাদশ দিনের দিন শ্রাদ্ধকার্য করলেন।

এমন সময়ে মন্থরা এসে উপস্থিত হল ভরতের সামনে। নানা-রকম গয়না ও দামী দামী কাপড়-চোপড় পরে এসেছে সে, সর্বাঙ্গে মেখেছে চন্দন—এমন কি, কুঁজটিতে পর্যন্ত। তার ধারণা ঃ ভরত নিশ্চয়ই তাকে মোটা পুরস্কার দেবেন, কারণ তার মন্ত্রণার ফলেই ত রামের বদলে আজ সিংহাসনে বসতে চলেছেন ভরত।

কিন্তু কুবজাকে দেখতে পাওয়ামাত্র ভরত তাকে ধরে দিলেন শত্রুঘ্নের হাতে। শত্রুঘ্ন তাকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগলেন,—বুঝি বা, মন্থরার কুঁজটি গুঁড়ো হয়ে যায়—প্রাণ হারায় সে। কিন্তু স্ত্রীবধ করলে রাম অপ্রসন্ন হবেন, তাই ভরতের আদেশে শত্রুঘ্ন শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন মন্থরাকে। সে অর্ধমৃত হয়ে ভূতলে পড়ে আর্তনাদ করতে লাগল।

ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম

দশরথের শ্রাদ্ধশান্তির পরদিন রাজপুরুষেরা ভরতকে সিংহাসনে বসতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ভরত বললেন ঃ "আমাদের এই ইক্ষ্বাকুকুলের নিয়ম হল যে, জ্যেষ্ঠ রাজা হবেন। সুতরাং, কখনই আমি সিংহাসনে বসব না। আমি বনে গিয়ে রামকে ফিরিয়ে আনব—তিনিই হবেন রাজা। তাঁর বদলে আমি থাকব বনবাসে চোদ্দ বছরের জন্য। আপনারা বনযাত্রার আয়োজন করুন।"

ভরতের কথা শুনে 'ধন্য ধন্য' করতে লাগলেন সভাসদেরা, আনন্দের অশ্রু নামল তাঁদের চোখ বেয়ে।

পরদিন বনযাত্রা করলেন ভরত। সমস্ত পাত্র মিত্র মন্ত্রী

পুরোহিত সৈন্য-সামন্ত তাঁর সঙ্গে চললেন। তিন রানী—কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা ত গেলেনই। আর গেল অযোধ্যার লোক—যারা শিশু বা কুলস্ত্রী নয়, বয়সের ভারে একেবারে অথর্ব হয়ে পড়েনি যারা। সবাই চলল ভরতের সঙ্গে রামকে ফিরিয়ে আনতে বন থেকে।

ক্রমে দলবল নিয়ে ভরত উপস্থিত হলেন শৃঙ্গবেরপুরে—নিষাদরাজ গুহের রাজ্যে। সংবাদ পেয়ে উদ্বিগ্ন হলেন নিষাদরাজঃ রামের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে এলেন নাকি ভরত? "তা যদি হয়," স্থির করলেন গুহ "তবে কিছুতেই নির্বিঘ্নে গঙ্গা পার হতে দেব না ভরতকে।"

গুহ দেখা করলেন ভরতের সঙ্গে। এ-কথা সে-কথার পর ভরতকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ "রাজপুত্র, রামের খোঁজে চলেছ কেন? তাঁর কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে নেই ত তোমার?"

ভরত বললেনঃ "ছি-ছি, কি বলছ তুমি? রাম আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—পিতৃতুল্য। তাঁর ক্ষতি করব আমি! আমি যাচ্ছি তাঁকে ফিরিয়ে আনতে।"

ভরতের কথা শুনে মুগ্ধ হলেন গুহ, বললেনঃ "তুমিই ধন্য, ভরত! বিনা চেষ্টায় এত বড় রাজ্য পেয়ে কে পারে তোমার মত তা ত্যাগ করতে?"

সে রাত্রি শৃঙ্গবেরপুরে কাটিয়ে পরদিন ভরত পৌঁছলেন ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে।

ভরদ্বাজও গুহের মত সন্দেহ করলেন ভরতকে, জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি এখানে এলে কেন, ভরত? আমার ত ভাল মনে হচ্ছে না। নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করার জন্য রামকে হত্যা করতে চাও নাকি তুমি?"

ভরত সখেদে বললেন: "ভগবন্, আপনিও আমাকে সন্দেহ করলেন! নাঃ, আমার মরণই ভাল। আমি কৈকেয়ীর পুত্র বটে, কিন্তু রামের রাজ্য হরণ করার উদ্দেশ্য আমার বিন্দুমাত্র নেই। আমি যাচ্ছি তাঁকে ফিরিয়ে আনতে।"

এ কথায় অত্যন্ত প্রীত হলেন ভরদ্বাজ। তিনি তাঁর তপস্যাবলে ভরত ও তাঁর বাহিনীর জন্য অত্যুত্তম আহার আনন্দ ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। পরদিন প্রভাতে রামের সন্ধানে চিত্রকূট-পর্বতের অভিমুখে চললেন ভরত।

চিত্রকূটের অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা। সীতাকে সেই শোভা দেখাচ্ছিলেন রাম। সহসা দূরে সৈন্য-কোলাহল শোনা গেল, অশ্বখুরের আঘাতে ধুলো উড়ে ছেয়ে গেল আকাশ।

লক্ষ্মণ একটি উঁচু শালগাছে চড়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। গাছের উপর থেকেই তিনি রামকে বললেন: "সীতাকে কুটিরের মধ্যে যেতে বলুন। আপনি ধনুর্বাণ নিয়ে প্রস্তুত হন। ভরত সসৈন্যে আসছে আমাদের হত্যা করতে। আজ আমরা তাকে বধ করব, কৈকেয়ীকেও সংহার করব।"

রাম বললেন: "ভুল করছ, লক্ষ্মণ,—ভরত কখনই আমাদের বধ করতে আসেনি। অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল সে, আমাদের বনগমনে মনোব্যথা পেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। গাছ থেকে নেমে এস তুমি।"

এমন সময়ে সদলে ভরত এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। জটাবল্কলধারী রামকে দেখে তিনি ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বিলাপ করতে লাগলেন: "হায়, প্রজারা নিত্য যাঁর উপাসনা করে, আমার সেই অগ্রজ রাম কিনা আজ বাস করছেন বন্য পশুদের সঙ্গে!

অঙ্গ যাঁর সতত চন্দনে চর্চিত থাকত, তাঁরই অঙ্গ আজ কিনা ধূলায় মাখা! আর কিনা, আমারই জন্য রামের আজ এত কষ্ট! এ দুঃখ আমি রাখি কোথায়? ধিক্ আমার জীবনে!"

ভরত ও শত্রুঘ্নকে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন রাম। তাঁরও চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল দরবিগলিতধারে।

ভরত তখন রাজা দশরথের মৃত্যু-বৃত্তান্ত জানালেন রামকে। শুনে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা অত্যন্ত কাতর হয়ে রোদন করতে লাগলেন। মন্দাকিনী-নদীতে গিয়ে রাম মৃত পিতার উদ্দেশ্যে তর্পণ করে পিণ্ডদান করলেন।

এবার ভরত রামকে অনুরোধ করলেন অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করতে। রাম রাজী হলেন না, বললেন: তা করলে পিতার আদেশ লঙ্ঘন করা হবে।

ভরত বললেন: "পিতার নিন্দা করব না। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ বয়সে মোহবশে যে অন্যায় করে গেছেন, আপনি তার প্রতিকার করুন। আমি হীনবুদ্ধি, বয়সে কনিষ্ঠ, আপনি থাকতে কি করে সিংহাসনে বসতে পারি আমি? আপনি রাজা হয়ে সকল লোককে সন্তুষ্ট করুন। হে ভ্রাতঃ, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি আমার মায়ের কলঙ্ক মোচন করুন, আমাদের পিতাকে রক্ষা করুন পাপ থেকে। আমাকে দয়া করুন।"

ভরতের কথা শুনে উপস্থিত সকলে 'ধন্য ধন্য' করতে লাগলেন।

রাম বললেন: "দেখ ভরত, পুত্রের লালনপালন করার জন্য মাতাপিতা যা করেন, তার প্রতিদান দেওয়া যায় না। তাঁদের আদেশ পালন করা পুত্রের অবশ্যকর্তব্য। পিতা আমাকে যে আদেশ করে গেছেন, কখনই আমি তার অন্যথা করব না।"

ভরত তখন মাটিতে কুশাসন বিছিয়ে বসে পড়লেন, বললেন : "আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত না অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করতে রাজী হবেন, ততক্ষণ এমনি বসে থাকব আমি—অন্নজল স্পর্শও করব না।"

রাম অনেক বুঝিয়ে এই কঠোর সঙ্কল্প থেকে নিবৃত্ত করলেন ভরতকে।

ভরত তখন বললেন : "একান্তই যদি আপনি পিতৃসত্য রক্ষা করতে চান, তাহলে আমিই আপনার পরিবর্তে চোদ্দ বছর বনে বাস করব। আপনি ফিরে যান অযোধ্যায়।"

এতেও সম্মত হলেন না রাম, বললেন : "পিতা আমাকে বা তোমাকে যে কাজে নিযুক্ত করে গেছেন, তাতে প্রতিনিধি-নিয়োগ অসঙ্গত। তুমি ফিরে যাও, ভরত। চোদ্দ বছর পরে বনবাসব্রত উদ্‌যাপন করে আমিও ফিরে যাব অযোধ্যায়।"

মুনিঋষিরাও রামের কথা সমর্থন করলেন। ভরত তখন বললেন : "ভ্রাতঃ, তাহলে আপনার স্বর্ণপাদুকা আমাকে দিন। ঐ পাদুকা আমি সিংহাসনে স্থাপন করব, এবং নিজে জটাবল্কল পরে ফলমূল খেয়ে আপনার প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করব। কিন্তু চোদ্দ বছর পেরিয়ে গেলেও যদি না আপনি ফেরেন, তাহলে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দেব আমি।"

রাম সম্মত হলেন। তাঁর স্বর্ণপাদুকা নিয়ে ভরত কোশলে ফিরলেন। কিন্তু রামহীন অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন না তিনি। নন্দীগ্রামে নতুন রাজধানী গড়ে রামের পাদুকা তিনি সিংহাসনে স্থাপন করলেন। তারপর নিজে সন্ন্যাসীর মত জীবন-যাপন করতে করতে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন, আর পথ চেয়ে রইলেন রামের আগমন-প্রতীক্ষায়।

ভরত চলে গেলে রাম একদিন মুনিদের কাছে শুনতে পেলেন যে, চিত্রকূটের নিকটেই দণ্ডকারণ্য। সেই অরণ্যের একটি প্রদেশ হল জনস্থান। সেখানে বাস করে লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খর। খর ও তার অনুচরদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন দণ্ডকারণ্যের তপস্বীরা। বহু তপস্বী প্রাণ হারিয়েছেন রাক্ষসদের হাতে।

এ কথা শুনে রাম স্থির করলেন ঃ খর ও তার অনুচরদের সংহার করবেন তিনি। তাই তিনি চিত্রকূট ত্যাগ করে দণ্ডকারণ্যে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন।

চিত্রকূট ত্যাগ করে যাবার সময়ে অত্রিমুনির তপস্বিনী পত্নী অনসূয়া বিবিধ দিব্য অলঙ্কার উপহার দিলেন সীতাকে। সেই সব অলঙ্কার পরায় সীতার রূপলাবণ্য বহুগুণে বেড়ে গেল—লক্ষ্মী-প্রতিমার মত শোভা পেতে লাগলেন তিনি।

অরণ্যকাণ্ড

বিরাধ-বধ ও জটায়ুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

নয়ন-ভুলান শোভা দণ্ডকারণ্যের। বিশাল বৃক্ষগুলির মাথা যেন সব গিয়ে ঠেকেছে আকাশে। বনমধ্যে মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা—কচি সবুজ ঘাসে ঢাকা; সে সব জায়গায় অসংখ্য মুনিঋষির আশ্রম। যজ্ঞের ধোঁয়ায়, বেদপাঠের ধ্বনিতে পবিত্র গম্ভীর হয়ে উঠেছে সেই বিশাল বনের আলো-বাতাস।

সেই অরণ্যের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে সহসা এক ভীষণ রাক্ষসের সামনে পড়লেন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা। পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড শরীর সে রাক্ষসের, কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয় যেন বাজ পড়ছে, চোখদুটি তার বড় বড় দীঘির মত, মুখের হাঁ আর পেটের পরিধি দেখে আতঙ্ক জাগে মহাবীরের মনেও।

রাক্ষস হঠাৎ সীতাকে কোলে তুলে নিয়ে রাম-লক্ষ্মণকে বলল: "আমি বিরাধরাক্ষস। এই সুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে করব আমি। আর, তোমাদের দুজনকে মেরে রক্তপান করব। ব্রহ্মার বরে কোন অস্ত্রে মরণ হবে না আমার।"

রাম বিরাধের প্রতি সাতটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। বাণগুলি বিরাধের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে গেল, কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হল না তার! বিরাধ তখন সীতাকে ছেড়ে দিয়ে বিশাল এক শূল নিয়ে আক্রমণ করল রাম-লক্ষ্মণকে। দু ভাই অসংখ্য তীর ছুড়ে তার দেহ বিদ্ধ করলেন, কিন্তু সে হেসে একটা হাই তুলতেই সমস্ত বাণ খসে পড়ে গেল। রাম তখন দুই বাণ ছুড়ে বিরাধের শূলটি কেটে

ফেললেন এবং এক ভীষণ খড়্গ দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন তার দেহে।

রাক্ষস বিষম ক্রোধে রাম-লক্ষ্মণকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঘোর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করার উপক্রম করল। সীতা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন। রাম-লক্ষ্মণ তখন চাপ দিয়ে রাক্ষসের বাহু দুটি ভেঙে দিলেন। সে মূর্ছিত হয়ে বিশাল এক পাহাড়ের মত লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। রাম-লক্ষ্মণ একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে বিরাধকে মাটি-চাপা দিয়ে মেরে ফেললেন।

এরপর সীতাকে নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যের নানা মুনির আশ্রমে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এইভাবে কেটে গেল সুদীর্ঘ দশ বৎসর। একদিন তাঁরা গেলেন মহামুনি অগস্ত্যের আশ্রমে। অগস্ত্য বহু দিব্যাস্ত্র উপহার দিলেন রামকে এবং গোদাবরী-নদীর তীরে রমণীয় পঞ্চবটী-বনে গিয়ে বাস করতে উপদেশ দিলেন।

পঞ্চবটীর মুখে এক বিরাট্‌কায় পক্ষীর দর্শন পেলেন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা। পক্ষীটির নাম: জটায়ু, রাজা দশরথের বন্ধু তিনি। রাম তাঁকে অনুরোধ করলেন বনমধ্যে সীতাকে রক্ষা করার ভার নিতে। জটায়ু সানন্দে রাজী হলেন। জটায়ুকে প্রণাম করে পঞ্চবটীতে প্রবেশ করলেন তিনজনে।

খর-দূষণ-বধ

পঞ্চবটীতে এসে গোদাবরী-নদীর অনতিদূরে একটি মনোহর পদ্মদীঘি দেখে মুগ্ধ হলেন রাম। সেই দীঘির কাছে মনোরম একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করলেন লক্ষ্মণ। সেই কুটিরে মনের সুখে বাস করতে লাগলেন তিনজনে।

একদিন তাঁরা কুটিরের সামনে বসে কথাবার্তা বলছেন, এমন সময়ে এক বিকটদর্শনা রাক্ষসী এসে উপস্থিত হল সেখানে। ভীষণ লম্বা তার পেটটি, চুলগুলি তামার মত লালচে, বেজায় খন্‌খনে তার গলার আওয়াজ, বয়সেও বুড়ী।

রামের রূপ দেখে আত্মহারা হল রাক্ষসী—তাঁকে বিয়ে করার সাধ হল তার। রামকে সে জিজ্ঞাসা করল : "কে তুমি? তপস্বীর বেশ তোমার, অথচ হাতে ধনুর্বাণ! কেন এসেছ এ দেশে? তুমি কি জান না : এ দেশটি হল রাক্ষসদের?"

রাম সরলমনে রাক্ষসীকে আত্মপরিচয় দিলেন। রাক্ষসী তখন বলল : "আমার নাম শূর্পণখা। লঙ্কার প্রবল-প্রতাপ রাজা রাবণ আমার ভাই। আমার শক্তির তুলনা নেই—যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারি আমি। তোমার রূপে আমি মুগ্ধ হয়েছি, তুমি আমাকে বিয়ে কর। সীতাকে নিয়ে কি করবে তুমি? ওর না আছে রূপ, না আছে গুণ। আমিই তোমার উপযুক্ত পত্নী। বল ত, সীতাকে আর তোমার ভাইকে খেয়ে ফেলি আমি; তারপর তোমাকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যের সর্বত্র ঘুরে বেড়াই।"

মৃদু হেসে রাম বললেন : "সীতাকে আমি ভালবাসি—তাকে ত্যাগ করতে পারব না। তোমার পক্ষেও সতীন নিয়ে ঘর করা শক্ত হবে। তুমি বরং আমার এই ভাই লক্ষ্মণকে বিয়ে কর।"

বুদ্ধিহীনা শূর্পণখা তখন লক্ষ্মণের সঙ্গে আলাপ করল। লক্ষ্মণও সহাস্যে বললেন : "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দাস আমি। আমাকে বিয়ে করলে ত তুমি দাসের ভার্যা হবে, তখন তোমাকেও হতে হবে দাসী। তার চেয়ে রামকেই বিয়ে কর তুমি; সীতার মত কুৎসিত বৃদ্ধাকে ত্যাগ করে নিশ্চয়ই তোমাকে বরণ করবেন তিনি।"

লক্ষ্মণের পরিহাস বুঝতে পারল না শূর্পণখা। রামকে সে বলল :

"তোমার কুরূপা ভার্যাকে ত্যাগ করে আমাকে বিয়ে করছ না কেন তুমি? এই দেখ, আমি এখনি খেয়ে ফেলছি ওটাকে।" এই বলে সে বিকট হাঁ মেলে সীতার দিকে ছুটে গেল।

ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন সীতা। তখন রামের আদেশে লক্ষ্মণ খড়্গ দিয়ে শূর্পণখার নাক-কান কেটে ফেললেন; তাতে রাক্ষসীর কুৎসিত মুখখানি আরও কুৎসিত হয়ে গেল। সে যন্ত্রণায় মেঘের মত গর্জন করতে করতে চলে গেল সেখান থেকে।

শূর্পণখা গেল জনস্থানে তার ভাই খরের কাছে। বাজের মত চিৎকার করতে করতে মাটিতে আছড়ে পড়ল সে ঠিক যেন ভেঙে-পড়া পর্বতচূড়ার মত!

খর উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল: ব্যাপার কি?

আর্তকণ্ঠে বলল শূর্পণখা: "দশরথের দুই ছেলে রাম ও লক্ষ্মণ তপস্বীর বেশে এসেছে এই বনে। সঙ্গে তাদের পরমাসুন্দরী এক যুবতী। তার জন্যই আমার এই দশা। তাদের তিনজনেরই রক্ত পান করতে চাই আমি।"

অমনি চোদ্দজন মহাবীর রাক্ষসকে ডেকে খর আজ্ঞা দিল রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে সংহার করতে। শূর্পণখা তাদের পথ দেখিয়ে রামের আশ্রমে নিয়ে চলল।

রাক্ষসদের দেখে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন রাম। চোদ্দ রাক্ষস রামকে লক্ষ্য করে চোদ্দ শূল নিক্ষেপ করল। রাম চোদ্দ বাণ ছুড়ে তৃণের মত কেটে ফেললেন সেই শূলগুলি, তারপর আরও চোদ্দ বাণে বধ করলেন রাক্ষসদের।

এ দেখে ভয়ে আর্তনাদ করতে করতে আবার খরের কাছে গেল শূর্পণখা।

শূর্পণখা বলল খরকে ঃ "তুমি যে চোদ্দজন রাক্ষসকে পাঠিয়েছিলে আমার সঙ্গে, তাদের সকলকে বধ করেছে রাম। মনে হয় ঃ তুমি নিজে সসৈন্যে গেলেও এঁটে উঠতে পারবে না তার সঙ্গে। মূঢ় কুলকলঙ্ক, তুমি যদি সামান্য তুটো মানুষকেও যুদ্ধে বধ না করতে পার, তবে তুমি জনস্থান শাসন করার যোগ্য নও—এখনি এ স্থান ছেড়ে চলে যাও সবান্ধবে।"

ভগিনীর অপমানকর বাক্যে হুতাশনের মত জ্বলে উঠল খর। সে তার চোদ্দ হাজার রাক্ষস-সৈন্য ও সমস্ত সেনাপতিদের নিয়ে নিজে চলল পঞ্চবটীতে রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

রাক্ষস-বাহিনীকে দেখে রামের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে নিয়ে পর্বতগুহার মধ্যে আশ্রয় নিলেন। আর, রাম বুকে কবচ এঁটে হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে প্রস্তুত হলেন যুদ্ধের জন্য।

রামকে লক্ষ্য করে এক হাজার তীর নিক্ষেপ করল খর। তীরগুলি রামের দেহে বিঁধল বটে, কিন্তু তিনি তাতে কাতর না হয়ে ভীষণভাবে পালটা শরনিক্ষেপ করতে লাগলেন। সেই শরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল রাক্ষস-সৈন্য, প্রধান সেনাপতি দূষণ পর্যন্ত মারা পড়ল। খরের পক্ষে জীবিত রইল একমাত্র সেনাপতি ত্রিশিরা।

তিনটি মাথা ত্রিশিরার। আগুনের মত উজ্জ্বল একখানি রথে চড়ে ত্রিশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় ভীমবেগে সে আক্রমণ করল রামকে।

রামের ললাট লক্ষ্য করে তিনটি বাণ ছুড়ল ত্রিশিরা। রাম হেসে বললেন ঃ "আঃ, আমার ললাটে যেন পুষ্পবৃষ্টি হল!" এই বলে তিনিও তিন বাণ ছুড়লেন ত্রিশিরাকে। তাতে মারা পড়ল সে।

এ দেখে খর ভীমপরাক্রমে আক্রমণ করল রামকে। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলল তুজনে। কিন্তু রামের বাণে ক্রমে ক্রমে সমস্ত অস্ত্র নষ্ট হয়ে গেল খরের। তখন সে বিশাল এক শালগাছ উপড়ে নিয়ে

মরিয়া হয়ে ধেয়ে এল রামের দিকে। রাম বাণ ছুড়ে চক্ষের নিমেষে সে গাছ কেটে ফেললেন, তারপর নিদারুণ এক শরনিক্ষেপ করে বধ করলেন খরকে।

এমনি করে দুষ্টবুদ্ধি রাক্ষসী শূর্পণখার জন্য রাক্ষসশূন্য হল জনস্থান।

মারীচ-বধ

খরের একটি মাত্র অনুচর কোন ক্রমে পালিয়ে বেঁচেছিল রামের বাণ থেকে। নাম তার ঃ অকম্পন। সে দ্রুতবেগে গেল লঙ্কায়—রাক্ষসরাজ রাবণকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল সে।

অকম্পনের মুখে এই দারুণ দুঃসংবাদ পেয়ে ক্রোধে জ্বলে উঠল রাবণ, বলল ঃ "আমি এখনি গিয়ে বধ করব রাম-লক্ষ্মণকে।"

অকম্পন বলল ঃ "মহারাজ, দেবাসুর কারও শক্তি নেই রামকে যুদ্ধে পরাস্ত করার। তার বধের উপায় আমি বলছি, শুনুন। রামের পত্নী সীতা অতুলনা সুন্দরী। রামও তাকে ভারী ভালবাসে। যেমন করে হোক, রামকে ফাঁকি দিয়ে সীতাকে হরণ করুন আপনি। তাহলে রাম প্রাণ হারাবে সীতার বিরহে।"

অকম্পনের পরামর্শ মনে ধরল রাবণের। সে বলল ঃ "তাই হবে।"

উজ্জ্বল একখানি রথে চড়ে মারীচের আশ্রমে উপস্থিত হল রাবণ। এ হল সেই তাড়কা-রাক্ষসীর পুত্র মারীচ, রামের বাণ খেয়ে যে ছিটকে পড়েছিল সমুদ্রতীরে। সেই থেকে সে তপস্বী সেজে বাস করছে দণ্ডকারণ্যে।

মারীচ সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করল রাবণকে। কুশলপ্রশ্নাদির পর রাবণ মারীচকে বলল : "বৎস মারীচ, জনস্থানের সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করেছে রাম। আমি তার সুন্দরী ভার্যাকে হরণ করতে চাই। তুমি সাহায্য কর আমাকে।"

মারীচ সভয়ে বলল : "অমন কাজও করবেন না, মহারাজ। এ পরামর্শ যে আপনাকে দিয়েছে, সে আপনার পরম শত্রু। রামের বাণের প্রতাপ আমি জানি। তার পত্নীকে হরণ করলে আপনার আর রক্ষা নেই। আপনি লঙ্কায় ফিরে যান, লঙ্কেশ্বর।"

মারীচের উপদেশ মেনে রাবণ লঙ্কায় ফিরে গেল।

ভাগ্য যার বিরূপ, শান্তিতে থাকতে পারবে কেন সে? তাই মারীচের কাছ থেকে ফিরতে না ফিরতেই নাককান-কাটা শূর্পণখা এসে উপস্থিত হল রাবণের সভায়।

কঠোর কণ্ঠে রাবণকে বলল শূর্পণখা : "এখনও আরামে বিলাসে লঙ্কায় বসে আছ তুমি! আর, ওদিকে রাম একাই যে রাক্ষসশূন্য করেছে জনস্থান।"

রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করল : "কে রাম? আর, তোমারই বা অমন নাককান-কাটা অবস্থা কেন?"

শূর্পণখা রাবণকে রামের পরিচয় দিয়ে বলল : "দশরথপুত্র রামের যেমন রূপ, তেমনি বীরত্ব। মাত্র তিন দণ্ডের মধ্যে সে সসৈন্যে বধ করেছে খর-দূষণকে। তার ভ্রাতা লক্ষ্মণও অত্যন্ত পরাক্রমশালী। রামের পত্নী সীতার মত সুন্দরী আমি কখনও কোথাও দেখিনি। তোমারই স্ত্রী হওয়ার যোগ্য সে। তোমার জন্য তাকে আনতে গিয়েছিলাম বলেই না লক্ষ্মণ আমার নাককান কেটে দিয়েছে! সীতাকে যদি চাও, তবে এখনি হরণ করে আন তাকে।"

শূর্পণখার কথা শুনে সীতাকে হরণ করাই স্থির করল রাবণ।

আবার রাবণ এসে উপস্থিত হল মারীচের আশ্রমে। এবার আর মারীচের কোন সৎ পরামর্শে কর্ণপাত করল না সে। মারীচকে সে বলল ঃ "মনোহর এক হরিণের মূর্তি ধারণ কর তুমি ; তারপর ঘুরে বেড়াতে থাক রামের কুটিরের সামনে। তাহলে তোমাকে দেখে সীতা মুগ্ধ হয়ে রাম-লক্ষ্মণকে অনুরোধ করবে তোমাকে জীবন্ত ধরার জন্য। রাম-লক্ষ্মণ তোমাকে ধরতে এলে তুমি পালিয়ে যেয়ো। তারা তখন তোমার পিছু-পিছু ছুটবে। সেই সুযোগে আমি হরণ করব সীতাকে। সীতাহারা হয়ে এমনিই প্রাণ হারাবে রাম।"

মারীচ ত প্রথমে কিছুতেই রাজী হবে না রাবণের কথামত কাজ করতে—রামের বাণের কথা আজও ভোলেনি সে। শেষে রাবণ বলল ঃ "মারীচ, তুমি যদি আমার কথামত কাজ কর, তবে আমার রাজ্যের অর্ধেক পাবে ; আর যদি না কর, তবে তোমাকে বধ করব আমি।"

এদিকেও মরণ, ওদিকেও মরণ! অগত্যা রাজী হতে হল মারীচকে।

কুটিরের সামনে পূজার ফুল তুলছিলেন সীতা। সহসা একটি হরিণকে দেখতে পেলেন তিনি। কি অনুপম রূপলাবণ্য হরিণটির! তার শিং দুটির ডগা রত্নের মত উজ্জ্বল, তার মুখে যেন নানা বর্ণের পদ্ম ফুটে আছে, কান দুখানি ইন্দ্রনীল-মণির মত মনোহর এবং নীলপদ্মের মত কোমল, তার গ্রীবা উন্নত, উদর সুনীল, পার্শ্বদেশ মহুয়া ফুলের মত রঙীন ; তার খুরগুলি যেন বৈদূর্যমণি, জঙ্ঘা সরু অথচ দৃঢ়, লেজটি যেন রামধনু!

হরিণটিকে দেখে মুগ্ধ হলেন সীতা। রাম-লক্ষ্মণকে ডেকে তিনি মৃগটিকে দেখালেন। রাম-লক্ষ্মণও হরিণটির অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখে বিস্মিত হলেন। লক্ষ্মণের মনে কিন্তু সন্দেহ জাগল, তিনি

বললেন : "এ নিশ্চয়ই প্রকৃত হরিণ নয়। শুনেছি : যে সব রাজা মৃগয়া করতে আসেন এ বনে, মায়াবী মারীচ রাক্ষস হরিণের বেশ ধরে তাদের প্রাণবধ করে। আমার মনে হয়, এ হরিণ হল ছদ্মবেশী মারীচ।"

লক্ষ্মণের কথায় কর্ণপাত করলেন না সীতা ; রামকে তিনি মিনতি করলেন : "ঐ হরিণটিকে জীবন্ত ধরে দাও ; ওটিকে আমি পুষব। আর, একান্তই যদি জীবন্ত ধরতে না পার, তবে বধ কর ওটিকে ; ওর বিচিত্র চর্মে আসন বানাব আমি।"

রাম তখন লক্ষ্মণকে বললেন : "মৃগটি বাস্তবিকই অপূর্ব। ওকে পাবার জন্য সবারই লোভ জাগবে। সুতরাং, সীতার দোষ নেই। যাহোক, আমি ওটিকে ধরতে যাচ্ছি। তুমি সাবধানে সীতাকে রক্ষা করো, মহাবল জটায়ু তোমার সহায় হবেন।"

ধনুঃশর ও খড়্গ নিয়ে রাম হরিণটিকে ধরার চেষ্টা করলেন। হরিণ বেগে ছুটে পালাল। রামও ছুটলেন তার পিছু-পিছু। হরিণটি এই তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়, পরক্ষণেই আবার আড়ালে চলে যায়। এমনি করে চলল হরিণে ও রামে লুকোচুরি খেলা। ক্রমে মায়ামৃগের পিছনে ছুটতে ছুটতে কুটির থেকে বহু দূরে এসে পড়লেন রাম।

অবশেষে রাম বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে বাণ ছুড়ে বিদ্ধ করলেন মৃগটিকে। শরাহত হয়ে মৃগরূপী মারীচ প্রাণ হারাল। কিন্তু মরার আগে সে নিজ মূর্তি ধারণ করে রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে "হা সীতা, হা লক্ষ্মণ" বলে উচ্চ আর্তনাদ করে উঠল।

মারীচের চিৎকার শুনে শিউরে উঠলেন রাম। মারীচের দুরভিসন্ধি তিনি বুঝতে পারলেন। তাঁর ভয় হল : পাছে সীতাকে একা কুটিরে রেখে লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের সন্ধানে আসেন। তাই ব্যস্ত হয়ে কুটিরের দিকে ছুটলেন তিনি।

সীতাহরণ

এদিকে মারীচের আর্তনাদ গিয়ে পৌঁছল সীতা ও লক্ষ্মণের কানে। সীতা উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন: "তোমার ভাই নিশ্চয়ই রাক্ষসের হাতে পড়েছেন—নিশ্চয়ই প্রাণসংশয় হয়েছে তাঁর। লক্ষ্মণ, তুমি শীঘ্র তাঁর সাহায্যে যাও।"

কিন্তু রামের নিষেধাজ্ঞা স্মরণ করে সীতাকে কুটিরে একা রেখে যেতে চাইলেন না লক্ষ্মণ। তিনি বললেন: "দেবী, দেব দানব গন্ধর্ব এমন কেউ নেই যে রামকে পরাস্ত বা বধ করতে পারে। আপনি নিশ্চিত থাকুন—এখনি মৃগ নিয়ে আসবেন তিনি। যে আর্তনাদ আপনি শুনেছেন, তা রামের নয়—ও আর্তনাদ নিশ্চয়ই কোন রাক্ষসী মায়া। রাম আপনাকে আমার তত্ত্বাবধানে রেখে গেছেন—আমি কখনই আপনাকে ছেড়ে যাব না।"

লক্ষ্মণের কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন সীতা, কঠোর ভাষায় দেবরকে বললেন: "দুষ্ট, তোমার মনের উদ্দেশ্য আমি বুঝেছি। তুমি ভরতের গুপ্তচর। যাতে রামের প্রাণহানি হয়, যাতে ভরতের রাজ্য নিষ্কণ্টক হয়, তারই ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের সঙ্গে বনে এসেছ তুমি।"

সীতার বাক্যে নিদারুণ মর্মব্যথা পেলেন লক্ষ্মণ, ক্রুদ্ধও হলেন, বললেন: "দেবী, আমার গুরুজন আপনি। আপনাকে কোন কথা বলতে চাই না। আপনার কঠোর বাক্য লোহার বাণের মত প্রবেশ করেছে আমার দুই কানে। বনদেবতারা শুনুন—সাক্ষী থাকুন তাঁরা, আমি রামের আজ্ঞায় আপনাকে রক্ষা করছিলাম; কিন্তু তা করতে দিলেন না আপনি। আপনার সর্বনাশ আসন্ন, তাই আমার প্রতি আপনার সন্দেহ। যাহোক, আমি রামের সন্ধানে চললাম।"

রামের প্রতীক্ষায় একাকিনী উদ্বিগ্ন চিত্তে কুটিরদ্বারে বসে আছেন সীতা। এমন সময়ে রাবণ এসে উপস্থিত হল সেখানে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বেশে। সীতা তাঁকে সন্ন্যাসীই ভাবলেন বটে, কিন্তু নদনদী বৃক্ষ বাতাস চিনতে পারল তাকে ; তাই বাতাস থেমে গেল, বৃক্ষগুলি ভয়ে হল নিস্পন্দ, বন্ধ হয়ে গেল খরস্রোতা গোদাবরী-নদীর স্রোত।

রাবণ জিজ্ঞাসা করল সীতাকে : "হে সুন্দরী, কে তুমি ? কেন এসেছ এই ঘোর বনে ?"

রাবণকে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ভেবে অভ্যর্থনা করলেন সীতা, তারপর আত্মপরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : "আমার কাহিনী ত শুনলেন। এখন বলুন আপনি কে ?"

রাবণ বলল : "দেবাসুর ও মানুষ যার ভয়ে ভীত, আমি সেই লঙ্কেশ্বর রাবণ। বহু অনুপমা সুন্দরী পত্নী আছে আমার, কিন্তু তোমার মত সুন্দরী আমি আর দেখিনি। তুমি আমার প্রধানা মহিষী হও। তাহলে পাঁচ হাজার দাসী অনুক্ষণ তোমার পরিচর্যা করবে।"

রাবণের কথায় অত্যন্ত কুপিতা হলেন সীতা, বললেন : দুষ্ট, মহাগিরির ন্যায় যিনি অটল, মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, সেই মহেন্দ্রসদৃশ রামের পতিব্রতা পত্নী আমি। তুমি শৃগাল হয়ে সিংহীকে ধরার জন্য হাত বাড়াচ্ছ। আমাকে হরণ করলে নিজের মরণ ডেকে আনবে তুমি।" এই বলে ক্রোধে ক্ষোভে ভয়ে বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের মত কাঁপতে লাগলেন সীতা।

রাবণ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে নিজমূর্তি ধারণ করল। বিরাট্ তার দেহ, দশটি তার মুখ, কুড়িখানি হাত, নীল মেঘের মত গায়ের রঙ্ ; তার পরনে রক্তবাস, অঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার। মনে হল যেন স্বয়ং মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে সীতার সামনে !

এমন সময়ে রাবণের রথখানি এসে উপস্থিত হল সেখানে। রথখানির নাম পুষ্পক। সেখানি ছিল রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যক্ষরাজ কুবেরের। রথখানি আকাশ-পথেও উড়ে যেতে পারত। কুবেরের কাছ থেকে এখানা কেড়ে নিয়েছিল রাবণ। সীতাকে সে জোর করে ধরে সেই রথে তুলে নিল। সীতা মুক্তিলাভের জন্য ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন, কিন্তু মহাশক্তিধর রাবণের সঙ্গে কি করে পেরে উঠবেন তিনি? রথ আকাশে উঠে বেগে ছুটে চলল। রাবণের কাণ্ড দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল বনস্থলী!

আকাশপথে ছুটে চলেছে রাবণের রথ। কিছু দূর গেলে সীতা দেখতে পেলেন: বিশাল এক বৃক্ষশাখায় নিদ্রা যাচ্ছেন জটায়ু। তিনি চিৎকার করে জটায়ুকে ডাকলেন।

সীতার চিৎকারে জেগে উঠলেন মহাপক্ষী। পাখসাটে ঝড় বইয়ে মহাপরাক্রমে তিনি আক্রমণ করলেন রাবণকে। রাবণ মহাবল যুবক, সঙ্গে তার বহু অস্ত্র; আর, জটায়ু অতিবৃদ্ধ ও অস্ত্রহীন। তবু, বহুক্ষণ ধরে নখর ও চরণের আঘাতে রাবণকে বিপর্যস্ত করে তুললেন জটায়ু। অবশেষে রাবণ কোনক্রমে খড়্গ দিয়ে জটায়ুর পা ও পাখা কেটে ফেলল এবং মারাত্মক আঘাত করল তাঁর পাঁজরে। রক্তাক্ত দেহে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রইলেন মহাপক্ষী। রাবণের রথ আবার ছুটে চলল।

কিছুক্ষণ পরে একটি পর্বতচূড়ায় পাঁচটি বানরকে বসে থাকতে দেখলেন সীতা। তিনি তাঁর উত্তরীয় ও আভরণগুলি দেহ থেকে খুলে ফেলে দিলেন পর্বতচূড়ার উপরে; ভাবলেন: বানরেরা হয়ত তাঁর সংবাদ রামকে দেবে।

সীতাকে নিয়ে লঙ্কায় পৌঁছাল রাবণ।
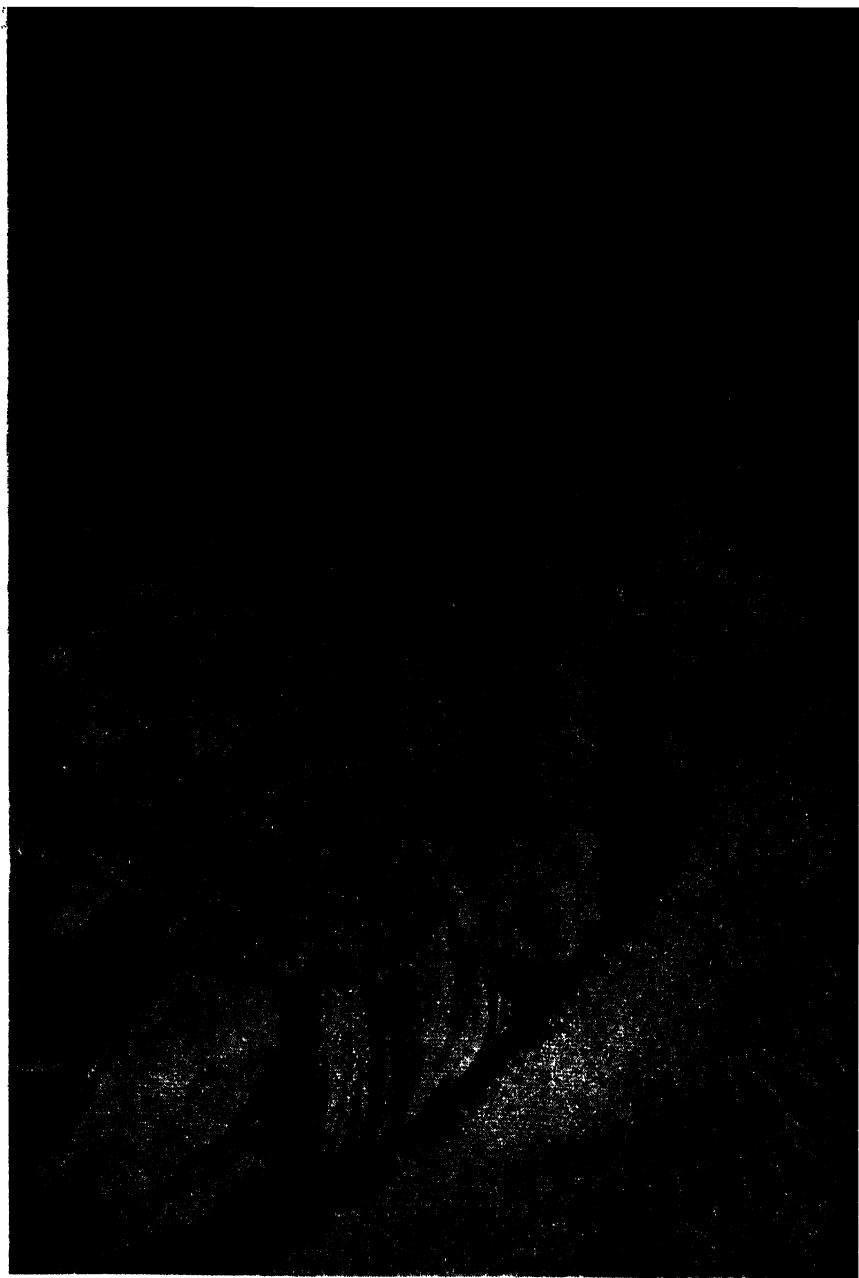
জটায়ুর মৃত্যু ও কবন্ধ-বধ

মারীচকে বধ করে যথাশক্তি দ্রুতপদে আশ্রমে ফিরে আসছিলেন রাম। পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হল লক্ষ্মণের।

লক্ষ্মণের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে উদ্বিগ্ন হলেন তিনি, বললেন: "অন্যায় করেছ, লক্ষ্মণ। স্ত্রীলোকের দুর্বাক্যে আত্মহারা হয়ে কর্তব্যচ্যুত হলে! একা ফেলে এলে সীতাকে!"

দু ভাই দ্রুতপদে এসে পৌঁছলেন আশ্রমে। কিন্তু হায়, কোথায় সীতা? সীতা নেই, কুটিরখানি তাই শীতের সরোবরের মত শ্রীহীন, বনস্থলীও যেন কাঁদছে, মৃগ ও পক্ষিগণ বেদনায় কাতর, বৃক্ষগুলি অধোমুখ! কাঁদছে সারা পঞ্চবটী—কাঁদছে সীতাহারা হয়ে।

শোকে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন রাম, পদ্মের মত চোখ দুটি তাঁর রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে চতুর্দিকে খুঁজেও সীতাকে দেখতে পেলেন না তিনি। কদম্বতল কুঞ্জবন পর্বত নদী প্রস্রবণ—কোথাও নেই সীতা!

খুঁজতে খুঁজতে রাম-লক্ষ্মণ মুমূর্ষু জটায়ুকে দেখতে পেলেন। রক্তাক্তদেহে পড়ে আছেন মহাপক্ষী। সীতার শোকে সহজবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছিল রামের। তাই তিনি ভাবলেন: জটায়ু আসলে পক্ষী নন—রাক্ষস, তিনিই সীতাকে বধ করে আহার করেছেন! এই ভেবে জটায়ুকে বধ করার জন্য ধনুঃশর হাতে নিলেন রাম।

জটায়ু তখন রক্তবমন করছেন। রামকে তিনি বললেন: "বৎস, ভুল বুঝে হত্যা করো না আমাকে। সীতাকে হরণ করেছে দুর্বৃত্ত রাবণ, আমার প্রাণও হরণ করেছে সে। সীতাকে নিয়ে সে পালাচ্ছে দেখে আমি বাধা দিয়েছিলাম তাকে। কিন্তু আমি বৃদ্ধ ও নিরস্ত্র,

তাই পেরে উঠিনি তার সঙ্গে। আমাকে মারাত্মকভাবে আহত করে সীতাকে নিয়ে পালিয়েছে সে।”

রামের হাত থেকে ধনুঃশর খসে পড়ল ; জটায়ুকে আলিঙ্গন করে লক্ষ্মণকে তিনি বললেন ঃ “ভাইরে, বড় দুর্ভাগা আমি ! রাজ্যনাশ বনবাস পিতৃবিয়োগ সীতাহরণ—সবই আমার ভাগ্যলিপি। শেষে কিনা পিতৃবন্ধু মহাবল গৃধ্ররাজ জটায়ুও প্রাণ হারালেন আমার জন্য !”

তারপর তিনি ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন জটায়ুকে ঃ “বলুন, তাত, রাবণকে দেখতে কেমন ? কত শক্তিধর সে ? কোথায় সে থাকে ?”

কিন্তু জটায়ুর চোখে তখন মরণ নেমেছে, কথা বলার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছেন তিনি, কোনমতে বললেন ঃ “দুরাত্মা রাবণ সীতাকে নিয়ে দক্ষিণ দিকে গেছে আকাশপথে।” এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার রক্তবমন করলেন জটায়ু, তাঁর দেহটা একবার কেঁপে উঠেই প্রাণশূন্য হল।

জটায়ুর জন্য বহু বিলাপ করলেন রাম। তারপর দু ভাইয়ে মিলে গৃধ্ররাজের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করে আবার সীতার অন্বেষণ আরম্ভ করলেন।

ক্রমে জনস্থান থেকে ক্রোশ ছয়েক দূরে এসে উপস্থিত হলেন রাম-লক্ষ্মণ। সহসা এক ভীষণা রাক্ষসী একটা হরিণ খেতে খেতে এসে লক্ষ্মণকে বলল ঃ “আমার নাম অয়োমুখী। তুমি বিয়ে কর আমাকে।”

লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে খড়্গ দিয়ে অয়োমুখীর নাক-কান কেটে দিলেন। বিকট চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল সে।

বিপদের উপর বিপদ্ ! আর কিছু দূর অগ্রসর হতে না হতেই ভয়ঙ্কর এক কবন্ধের সম্মুখীন হলেন দু ভাই। কবন্ধের মুখ নেই, গলা নেই ঃ পেটের মধ্যেই তার মুখ আর সে মুখে আগুনের ভাঁটার

মত একটা চোখ জ্বলছে। যোজনপ্রমাণ দীর্ঘ তার হাত দুখানি; সেই হাত বাড়িয়ে পশুপক্ষী ধরে খাচ্ছে সে; সেই হাত বাড়িয়েই সে ধরল রাম-লক্ষ্মণকে।

কবন্ধের কবলে পড়ে লক্ষ্মণের মত বীরপুরুষও ভীত হলেন। রামকে তিনি বললেন: "আমাকে এই কবন্ধের কবলে ছেড়ে দিয়ে আপনি পালান।"

কিন্তু রাম কি রাজী হতে পারেন তাতে? প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে তিনি যাবেন পালিয়ে! ছিঃ!

তখন দু ভাই খড়্গ দিয়ে কবন্ধের বাহু দুটি কেটে ফেললেন। ঘোর আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে, তারপর দীনভাবে আত্মপরিচয় দিল। সে ছিল শ্রী নামক দানবের পুত্র দনু। মুনিশাপে সে রাক্ষস হয়ে নানা উপদ্রব করতে আরম্ভ করে। তাতে দেবরাজ ইন্দ্র তাকে শাস্তি দিয়ে কবন্ধে পরিণত করেন। এখন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম যখন তার বাহু ছেদন করেছেন, তখন শাপমোচন হয়েছে তার।

দনুর অনুরোধে রাম-লক্ষ্মণ চিতা সাজিয়ে তাকে দাহ করলেন। জ্বলন্ত চিতা থেকে মনোহর পূর্বমূর্তি ধারণ করে উঠল দনু। রামকে সে পরামর্শ দিল ঋষ্যমূক-পর্বতে গিয়ে বানরপতি সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে, তাহলে সীতার উদ্ধারের উপায় হবে।

এরপর রাম-লক্ষ্মণ গিয়ে পৌঁছলেন মতঙ্গমুনির আশ্রমে। সেখানে একাকিনী বাস করছিলেন এক বৃদ্ধা শবরী অর্থাৎ ব্যাধিনী। নিম্নজাতীয়া হয়েও তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তিনি। বড় সাধ ছিল তাঁর: পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে দর্শন করবেন। বহুদিন ধরে প্রতীক্ষা করার পর আজ পূর্ণ হল তাঁর সে আশা। রামের সাক্ষাতেই দেহত্যাগ করলেন পুণ্যবতী সিদ্ধা শবরী।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

রাম-সুগ্রীবের মৈত্রী

পম্পা। নানা বর্ণের পদ্মে শোভিত মনোহর সরোবর পম্পা। অসংখ্য মৎস্য ও জলচর পক্ষীতে পূর্ণ শোভাময়ী পম্পা। পম্পাতীরের আকাশ-ছোঁয়া তরুরাজির ছায়া পড়েছে তার কাকচক্ষুর মত নির্মল জলে। বসন্ত-বাতাসে থর্‌থর্‌ করে শিউরে উঠছে সেই কাকচক্ষু জল। আর, সেই শিহরনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে শিহরিত হচ্ছে নানা পাখির নানা কূজন। মায়াময় আকাশ, মায়াময়ী পম্পা!

পম্পা-সরোবরের তীরে এসে পৌঁছলেন রাম-লক্ষ্মণ। কাছেই ঋষ্যমূক-পর্বতশৃঙ্গ। সেই শৃঙ্গে পাঁচটি সহচর বানরের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন বানরপতি সুগ্রীব। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর ভয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন ওখানে।

ঋষ্যমূক-পর্বতশৃঙ্গ থেকে সশস্ত্র রাম-লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন সুগ্রীব। তিনি ভীত হলেন, ভাবলেন: বোধহয় তাঁকে বধ করার জন্য লোক পাঠিয়েছেন বানররাজ বালী।

সুগ্রীবের পঞ্চ অনুচরের মধ্যে হনুমান্‌ ছিল জ্ঞানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে শক্তিতে বানরজাতির সেরা। সুগ্রীব তাকে পাঠালেন রাম-লক্ষ্মণের কাছে তাঁদের পরিচয় জানবার জন্য।

চতুরচূড়ামণি হনুমান্‌ ভিক্ষুর রূপ ধারণ করে গেল রাম-লক্ষ্মণের কাছে। দু ভাইকে প্রণাম করে উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় সে জিজ্ঞাসা করল তাঁদের: "কে আপনারা? তপস্বীবেশ ধারণ করলেও আপনাদের শক্তিমান্‌ রাজতুল্য রূপ ঢাকা পড়েনি! ধার্মিক বানরপতি সুগ্রীবের অনুচর আমি। সুগ্রীব তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর ভয়ে

পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন এই পর্বতে। আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে উৎসুক হয়েছেন তিনি।"

রামের আদেশে লক্ষ্মণ হনুমান্‌কে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন: "আমরাও বানরপতি সুগ্রীবকে খুঁজছি, আমরাও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চাই। সীতা-উদ্ধারে তাঁর সাহায্য চাই আমরা।"

হনুমান্ তখন মহানন্দে নিজের মূর্তি ধারণ করে রাম-লক্ষ্মণকে পিঠে তুলে সুগ্রীবের কাছে নিয়ে গেল।

রামের পরিচয় পেয়ে হরষিত হলেন সুগ্রীব। তিনি বন্ধুত্ব-স্থাপনের কামনায় হাত বাড়িয়ে দিলেন। রাম সে হাত ধরে মৃদু চাপ দিয়ে গভীরভাবে আলিঙ্গন করলেন বানরপতিকে।

তারপর হনুমান্ দু খণ্ড কাঠ ঘষে আগুন জ্বালল। সেই আগুনকে সাক্ষী করে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন রাম ও সুগ্রীব।

তখন রাম বললেন সুগ্রীবকে: "হনুমানের মুখে তোমার দুঃখের কাহিনী আমি শুনেছি, বন্ধু,—শুনেছি তোমাকে স্বদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তোমার বড় ভাই বালী—তোমার ভার্যাকে হরণ করেছে সে। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি: বালীকে অবশ্য বধ করব।"

সুগ্রীব প্রীত হলেন, প্রত্যুত্তরে বললেন: "আমিও হনুমানের কাছে সীতাহরণের কাহিনী শুনলাম। অঙ্গীকার করছি: সীতাকে উদ্ধার করে দেব আমি।"

এই বলে সুগ্রীব রামকে জানালেন যে, রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাঁরা পঞ্চ বানর পর্বতশৃঙ্গ থেকে তা

দেখেছিলেন। তাঁদের দেখতে সীতাদেবী তাঁর উত্তরীয় ও আভরণ ফেলে দেন পর্বতশৃঙ্গের উপরে। সুগ্রীব সেগুলি কুড়িয়ে সযত্নে তুলে রেখে দিয়েছেন।

রামের অনুরোধে সেই উত্তরীয় ও আভরণগুলি পর্বতগুহার ভিতর থেকে নিয়ে এলেন সুগ্রীব। সেগুলি দেখে হাহাকার করে বিলাপ করতে লাগলেন রাম। তাঁর বিলাপে লক্ষ্মণ এবং পঞ্চ বানরের চক্ষুও সজল হয়ে উঠল।

বালী-সুগ্রীবের বিরোধের ইতিহাস ও সপ্তশালভেদ

এবার রামকে সুগ্রীব শোনালেন তাঁর সঙ্গে বালীর বিরোধের কাহিনী।

বালী ছিলেন কিষ্কিন্ধ্যারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসলেন তিনি। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীব জ্যেষ্ঠের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন।

কিছুকাল পরে মায়াবী নামে এক মহাশক্তিধর অসুরের সঙ্গে বিরোধ বাধে বালীর। একদিন রাত্রিতে কিষ্কিন্ধ্যার সমস্ত লোক ঘুমুচ্ছে, এমন সময়ে নগরীর সিংহদ্বারে এসে হানা দিল মায়াবী। সে সিংহনাদ শুনে জেগে উঠলেন বালী। তখনই বেরিয়ে এলেন তিনি অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। সুগ্রীবও তাকে অনুসরণ করলেন।

মহাবীর দুই ভাইকে একত্রে আসতে দেখে ভীত হল মায়াবী। ছুটে পালাতে লাগল সে। বালী-সুগ্রীবও তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। সহসা একটা সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল মায়াবী। বালীও সেই সুরঙ্গে ঢুকলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবকে বলে গেলেন সুরঙ্গের মুখে পাহারা দিতে।

এর পর দিন কাটে, সপ্তাহ কাটে, মাস কাটে ; ক্রমে ক্রমে কেটে যায় বৎসর। বালী আর ফেরেন না। জ্যেষ্ঠের প্রতীক্ষায় সুরঙ্গ-মুখে বসে রইলেন সুগ্রীব।

অবশেষে একদিন ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগল সেই গর্তের ভিতর থেকে, আর শোনা গেল বহু অসুরের গর্জন। কিন্তু বালীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল না মোটেই। তাতে সুগ্রীবের ধারণা হল ঃ অসুরেরা নিশ্চয়ই বধ করেছে বালীকে। সুগ্রীব তখন প্রকাণ্ড একখানা পাথর সেই গর্তের মুখে চাপা দিয়ে শোকার্ত চিত্তে ফিরে এলেন কিষ্কিন্ধ্যায়। মন্ত্রীরা সব বিবরণ শুনে সুগ্রীবকে সিংহাসনে বসালেন।

কিছু কাল কাটে। সহসা একদিন বালী ফিরে এলেন কিষ্কিন্ধ্যায়। সুগ্রীবকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখে বিষম ক্রুদ্ধ হলেন তিনি। সুগ্রীব সসম্মানে বালীকে অভিবাদন করে সিংহাসন থেকে নেমে দাঁড়ালেন, জ্যেষ্ঠকে সিংহাসনে বসতে অনুরোধ করলেন।

কিন্তু বালীর ক্রোধ শান্ত হল না এতে। মন্ত্রীদের ও সুগ্রীবকে কঠিন তিরস্কার করে তিনি বললেন ঃ মায়াবীকে তিনি বধ করেছেন সবান্ধবে। শত্রু নিধন করে ফিরে আসতে গিয়ে তিনি দেখেন যে গহ্বরের মুখে প্রকাণ্ড একখানা পাথর চাপা দেওয়া। লাথি মেরে সেই পাথর সরিয়ে উঠে এসেছেন তিনি। বালী বললেন ঃ নিশ্চয়ই রাজ্যলোভে এ দুষ্কর্ম করেছে সুগ্রীব।

বালীর ভুল ধারণা দূর করবার জন্য তাঁকে কত বোঝালেম সুগ্রীব, মন্ত্রীরাও বোঝালেন ; কিন্তু কোন কথাতেই কর্ণপাত করলেন না তিনি। সুগ্রীবকে তিনি একবস্ত্রে দূর করে দিলেন রাজ্য থেকে। পঞ্চ অনুচর সঙ্গে নিয়ে সুগ্রীব আশ্রয় নিলেন ঋষ্যমূক-পর্বতে।

এখানে বালী আসতে পারবেন না কখনও, কারণ তাতে তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে। সে আবার আরেক কাহিনী।

একদিন দুন্দুভি-নামে এক অসুর এল বালীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে। মহিষের মত মূর্তি দুন্দুভির, দেহে তার হাজার হাতির বল। কিন্তু বালী সহজেই তাকে তুলে ধরে মাটির উপর আছাড় মেরে বধ করলেন, তারপর তার মৃতদেহটা ছুড়ে ফেললেন এক যোজন দূরে।

দুন্দুভির মৃতদেহ পড়ল গিয়ে ঋষ্যমূক-পর্বতে মতঙ্গ-মুনির আশ্রমের কাছে। অসুরের রক্ত ছিটকে গেল আশ্রমের মধ্যে। এতে মতঙ্গ-মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন বালীকে ঃ তিনি বা তাঁর অনুচরদের কেউ যদি মতঙ্গের আশ্রমের এক যোজনের মধ্যে আসেন, তবে প্রাণ হারাবেন। তাই ঋষ্যমূকে নিরাপদ্ আশ্রয় পেয়েছেন সুগ্রীব, কারণ এখানে আসতে পারবেন না বালী বা তাঁর কোন অনুচর।

এ কাহিনী বর্ণনা করে সুগ্রীব চিন্তিত মুখে বললেন ঃ "বালী মহাবীর। তুমি কি তাঁকে বধ করতে পারবে, রাম?"

সুগ্রীবের কথা শুনে লক্ষ্মণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কি করলে তোমার বিশ্বাস হবে যে, বালীকে বধ করা রামের পক্ষে নিতান্ত সহজ কাজ?"

সুগ্রীব বললেন ঃ "সামনে ঐ যে সাতটি বিশাল শালগাছ দেখছ, বালী ওগুলিকে একসঙ্গে এমন নাড়া দিতে পারেন যে, ওদের সমস্ত পাতা ঝরে পড়বে। আর, ঐ দেখ, দুন্দুভির কঙ্কাল পড়ে আছে পাহাড়ের মত। তা রাম যদি বাণ ছুড়ে একটি শালগাছও ভেদ করতে পারেন, এবং পা দিয়ে দুন্দুভির কঙ্কাল তুলে আট শ হাত দূরে ছুড়ে ফেলতে পারেন, তবেই বুঝব যে, বালীকে বধ করা অসাধ্য নয় তাঁর পক্ষে।"

রাম তখনই তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে দুন্দুভির কঙ্কালটি তুলে ছুড়ে ফেলে দিলেন দশ যোজন দূরে।

তবুও সন্দেহ দূর হল না সুগ্রীবের, ভরসা এল না তাঁর মনে। তিনি বললেন : "বালী যখন দুন্দুভির দেহ নিক্ষেপ করেন, তখন সে দেহ ছিল তাজা—তাই ভারীও ছিল অনেক বেশী। এখন সে দেহ বহু বছর ধরে রোদে শুকিয়ে হালকা হয়ে গেছে অনেক, তাই ওটাকে অত দূরে ছুড়ে ফেলা আর তেমন শক্ত কাজ নয়। রাম, তুমি যদি ঐ শালগাছগুলির একটিকেও বাণ ছুড়ে ভেদ করতে পার, তবেই বুঝব : বালীকে বধ করতে পারবে তুমি।"

এ কথা শুনে রাম ধনুক হাতে নিয়ে একটি তীর নিক্ষেপ করলেন। সে তীর মহাবেগে ছুটে গিয়ে একে একে সাতটি শালগাছকেই ভেদ করে প্রবেশ করল মাটিতে, পরক্ষণেই আবার ফিরে এল রামের তূণীরে!

রামের ক্ষমতা দেখে চমৎকৃত হলেন সুগ্রীব। রামকে প্রণাম করে তিনি সহর্ষে বললেন : "প্রভু আমার, পারবে—তুমি পারবে। বালী ত দূরের কথা, দেবতারাও প্রাণ হারাবে তোমার বাণে। তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়ে ধন্য হয়েছি আমি।"

বালীবধ

বালী-বধের উদ্দেশ্যে কিষ্কিন্ধ্যায় যাত্রা করলেন সুগ্রীব। তাঁর পাঁচ অনুচর এবং রাম-লক্ষ্মণও সঙ্গে চললেন। কিষ্কিন্ধ্যা-নগরীর কাছে গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন তাঁরা। আর, সুগ্রীব একা নগর-দ্বারে গিয়ে ঘোর হুঙ্কার ছেড়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন বালীকে।

সুগ্রীবের হুঙ্কার শুনে মহাক্রোধে বেরিয়ে এলেন বালী। দুই ভাইয়ে আরম্ভ হল তুমুল যুদ্ধ।

এদিকে গাছের আড়ালে রাম পড়লেন ভারী বিপদে। বালী-সুগ্রীব দু ভাইয়েরই চেহারা অবিকল এক রকম,—কে যে বালী আর কে যে সুগ্রীব, চেনাই যায় না মোটে। পাছে বালীর বদলে সুগ্রীবকে বধ করে বসেন, এই ভয়ে রাম আর তীর ছুড়লেন না—ধনুঃশর হাতে নিয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

অসীম শক্তিশালী বালীর প্রহারে জর্জরিত হয়ে শীঘ্রই অবসন্ন হয়ে পড়লেন সুগ্রীব। শেষ পর্যন্ত তিনি কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেন ঋষ্যমূকে।

ঋষ্যমূকে পৌঁছে সুগ্রীব কঠোর তিরস্কার করলেন রামকে। শেষে রাম সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বলতে তিনি শান্ত হলেন।

আবার সদলে কিষ্কিন্ধ্যায় যাত্রা করলেন সুগ্রীব। এবারে রাম যাতে সুগ্রীবকে চিনতে পারেন, সেজন্য তাঁর গলায় একটি গজপুষ্পী-লতা বেঁধে দিলেন লক্ষ্মণ।

কিষ্কিন্ধ্যায় পৌঁছে আবার বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন সুগ্রীব। আবার প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হল দুই ভাইয়ে। দুজনেই প্রবল বিক্রমে লড়তে লাগলেন। কিন্তু দিগ্বিজয়ী বালীর সঙ্গে কতক্ষণ আর পেরে উঠবেন সুগ্রীব? ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন তিনি। তা দেখে রাম গাছের আড়াল থেকে বালীকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়লেন। সে শরাঘাতে অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন বানররাজ বালী।

তখন রাম-লক্ষ্মণ এবং অন্য সবাই গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে বালীর কাছে গেলেন। মহাবীর মহাকায় বালীকে মুমূর্ষাবস্থায় ভূতলে লুণ্ঠিত দেখে মর্মাহত হলেন তাঁরা।

এমন সময়ে বালী চৈতন্য লাভ করলেন, রামকে তিনি বললেন: "বুঝেছি, রাম, তুমিই হত্যা করেছ আমাকে। নইলে, সুগ্রীবের কি সাধ্য যে আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে? শুনেছি: তুমি নাকি পরম ধার্মিক, পরম ন্যায়পরায়ণ। বল, কি অপরাধে আড়াল থেকে বাণ ছুড়ে বধ করলে আমাকে? এই কি তোমার ধার্মিকতা? এই কি তোমার ন্যায়পরায়ণতা?"

রাম উত্তর দিলেন: "সুগ্রীব আমার সখা। তাঁর পত্নী ও রাজ্য উদ্ধার করে দেবার জন্য অঙ্গীকার করেছি আমি। আমাকে সে অঙ্গীকার পালন করতেই হবে। তাছাড়া, তুমি অধর্ম করে তোমার ভাই সুগ্রীবকে নির্বাসিত করেছ রাজ্য থেকে, হরণ করেছ তাঁর পত্নীকে। সুতরাং, তোমাকে শাস্তি দেওয়া আমার কর্তব্য।"

বালী তখন করজোড়ে বললেন: "কমললোচন রাম, ঠিকই বলেছ তুমি। সুগ্রীবের প্রতি সত্যই আমি অন্যায় করেছি। যাক, এখন আমি ত মরতে চলেছি, দেখো: আমার মৃত্যুর পরে আমার পত্নী তারা ও পুত্র অঙ্গদের অপমান হয় না যেন।"

রাম বালীকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি অবশ্যই তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবেন। বালী তখন শান্ত মনে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যভার দিলেন, আর অঙ্গদকে উপদেশ দিলেন, সুগ্রীবের অনুগত হয়ে থাকতে।

তারপর মৃত্যু হল বালীর। আত্মীয়-পরিজনের ক্রন্দনরোলের মধ্যে মহাসমারোহে তাঁর প্রেতকৃত্য সম্পাদন করলেন অঙ্গদ ও সুগ্রীব।

রামের অনুমতি নিয়ে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করলেন; অঙ্গদ হলেন যুবরাজ।

রাম কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যা-নগরে প্রবেশ করলেন না। হনুমানকে তিনি

বললেনঃ "পিতৃসত্য পালনের জন্য চৌদ্দ বছর বনবাসে থাকব আমি। ঐ সময় উত্তীর্ণ না হলে কোন নগরে প্রবেশ করব না। এখন বর্ষাকাল আরম্ভ হয়েছে। আর চার মাস পরে কার্ত্তিক-মাসে রাবণ-বধের উদ্যোগ করতে হবে, কারণ যুদ্ধযাত্রার পক্ষে ঐ সময়টাই প্রশস্ত। এই ক মাস ঐ প্রস্রবণ-গিরিতে বাস করব আমি।"

বানরগণের সীতান্বেষণ

ক্রমে বর্ষাকাল কেটে গেল। এল শরৎ। শরৎও গেল। তথাপি সীতান্বেষণের কোন উদ্যোগ নেই সুগ্রীবের। তা দেখে লক্ষ্মণকে রাম বললেনঃ "আমি সহায়হীন সম্পদ্‌হীন রাজ্যহীন গৃহহীন; সুগ্রীবের শরণাপন্ন আমি। তাই বোধহয় সে তুচ্ছজ্ঞান করে আমাকে। নইলে কেন সে নিজের অঙ্গীকার ভুলবে—এখনও সীতার অন্বেষণ করছে না কেন সে? যাও, লক্ষ্মণ, তুমি গিয়ে বল তাকেঃ বাণের শক্তি আজও কমেনি আমার,—যে বাণে বালী প্রাণ হারিয়েছে, তেমন বাণ আরও অনেক আমার তূণে আছে।"

লক্ষ্মণ চললেন সুগ্রীবের কাছে। কিষ্কিন্ধ্যার রাজপ্রাসাদে গিয়ে তিনি দেখেনঃ ভোগ-বিলাসে আত্মহারা হয়ে আছেন সুগ্রীব। তখন তিনি প্রচুর তিরস্কার করলেন বানররাজকে।

সে তিরস্কারে চেতনা হল সুগ্রীবের। লক্ষ্মণকে তিনি বললেনঃ "বীর, রামের দয়াতেই রাজ্য ও সম্পদ্ লাভ করেছি আমি। আমি তাঁর আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। যদি অপরাধ করে থাকি, তবে ক্ষমা কর আমাকে।"

তখন সুগ্রীব চতুর্দিকে দূত পাঠালেন সেনাসংগ্রহের জন্য। দূতের

মুখে সংবাদ পেয়ে নানা দেশ থেকে নানা বর্ণের নানা আকারের কোটি কোটি বানর ও ভল্লুক এসে একত্র হল কিষ্কিন্ধ্যায়।

সুগ্রীব এবার সীতার সন্ধানে চারদিকে বানর ও ভল্লুকদের পাঠালেন। পুব দিকে তিনি পাঠালেন বিনত নামে এক বানরকুল-পতিকে; বিনতের সঙ্গে গেল এক লক্ষ বানর। দক্ষিণ দিকে গেল বালীপুত্র যুবরাজ অঙ্গদ; তার সঙ্গী হল নীল হনুমান গয় গবাক্ষ প্রভৃতি সেরা সেরা কপি। পশ্চিম দিকে গেলেন বালীর শ্বশুর সুষেণ দু লক্ষ বানর নিয়ে। আর, লক্ষ বানর নিয়ে উত্তর দিকে গেল শতবল নামে বানর-বীর।

সুগ্রীব সবাইকে বলে দিলেন: এক মাসের মধ্যে অবশ্যই সীতার সন্ধান করে ফিরে আসতে হবে তাদের; ফিরতে যার দেরী হবে, প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে তাকে।

হনুমানকে বিশেষ করে বলে দিলেন সুগ্রীব: "বানরশ্রেষ্ঠ, তোমার মত তেজস্বী বলবান্ জ্ঞানী ও নীতিমান্ আর কেউ নেই বানরদের মধ্যে। পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই যাবার ক্ষমতা তোমার আছে। সীতার সন্ধান তুমি এনো—উদ্ধারের উপায় করো তাঁর।"

সুগ্রীবের কথা শুনে রাম বুঝলেন যে, হনুমানের উপরই সব চেয়ে বেশী আস্থা রাখেন কিষ্কিন্ধ্যাপতি। তিনি তখন হনুমানকে বললেন: "কপিশ্রেষ্ঠ, আমি তোমার পথ চেয়ে রইলাম—সীতার সন্ধান নিয়ে এস তুমি। যদি জনকনন্দিনীর দেখা পাও, তবে এই আঙ্‌টিটি দেখিয়ো তাঁকে; তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন যে, আমিই তোমাকে পাঠিয়েছি।" এই বলে রাম তাঁর নাম-লেখা একটি আঙ্‌টি দিলেন হনুমানকে।

হনুমান হাত পেতে আঙ্‌টিটি নিলেন। তারপর তিনি প্রণাম করলেন রামকে আর সুগ্রীবকে।

এবার যাত্রা হল শুরু। সেই চার লক্ষাধিক বানর সীতার সন্ধানে চতুর্দিকে বেরিয়ে পড়ল। তাদের সিংহনাদে কলরবে আর পদধ্বনিতে কেঁপে উঠল পৃথিবী—বুঝি বা কেঁপে উঠল লঙ্কায় রাবণের সিংহাসনও!

দিন কাটে। এক দুই করে কেটে গেল ত্রিশ দিন ত্রিশ রাত্রি—মাস পুরল। পুব উত্তর ও পশ্চিম দিকে যে সব বানর গিয়েছিল, ফিরে এল তারা। সীতার কোন সন্ধান পায়নি কেউ। এখন দক্ষিণ দিকের দলটিই শুধু ভরসা। তাদের ফেরার পথ চেয়ে রইলেন রাম ও সুগ্রীব।

দক্ষিণদিকে সীতান্বেষণ

এদিকে দক্ষিণ দিকের প্রতিটি জনপদ প্রতিটি নদনদী বন-উপবন গিরি-শৈল গহ্বর-কন্দর তন্নতন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে চলেছে যুবরাজ অঙ্গদের দল। কিন্তু কোথায় সীতা?

একদিন বানরেরা এসে পৌঁছল এমন একটি জায়গায় যেখানে নদীতে জল নেই, গাছে ফল নেই, অরণ্যে নেই প্রাণী! অথচ বানরেরা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে পড়েছে।

এমন সময়ে ভয়ঙ্কর একটা অসুর আক্রমণ করল বানরদের। অঙ্গদ তাকেই রাবণ মনে করে এক চড়ে বধ করল।

বানররা আর চলতে পারে না—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল তারা। সহসা একটি গহ্বরের ভিতর থেকে নানা জলচর পাখি বেরিয়ে এল। তাদের দেখে অঙ্গদ বলল: "নিশ্চয়ই জলাশয় আছে ঐ গহ্বরের মধ্যে, নইলে ও

পাখিগুলির পাখা ভিজে কেন? চল, আমরা ঐ গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করি।"

যেই কথা, সেই কাজ! বানররা ঢুকল সেই গহ্বরের মধ্যে। বহু কষ্টে বহু অন্ধকার পথ পেরিয়ে অবশেষে এক অপূর্ব উপবনে উপস্থিত হল তারা। আলোয় আলোময় সে বন, নানা রত্নে পূর্ণ, উত্তম সব শয্যা ও আরামের উপকরণ সাজান আছে সেখানে।

আর আছেন এক বৃদ্ধা তাপসী ঐ উপবনে। ক্লান্ত বানরদের তিনি উত্তম সব খাদ্য-পানীয় দিলেন। সেই সব খেয়ে তৃপ্ত হল তারা, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল।

এবার বানরদের আবার যাত্রা করতে হবে সীতান্বেষণে। কিন্তু কিছুতেই গহ্বর থেকে বেরবার পথ খুঁজে পেল না তারা। তখন তারা সেই তাপসীর শরণাপন্ন হল।

তাপসী বললেন: "এক অপ্সরা এই গহ্বর-ভবনের অধীশ্বরী। তিনি আমার সখী। তাঁর অনুরোধে আমি এই ভবন ও ধনসম্পদ্ রক্ষা করছি। এখানে প্রবেশ করলে কেউ আর জীবিতাবস্থায় বেরতে পারে না। তা তোমরা যখন আমার শরণাপন্ন হয়েছ, তখন আমি তোমাদের তপোবলে উদ্ধার করব। তোমরা এখন চোখ বুজে বস।"

তাপসীর নির্দেশমত চোখ বুজে বসল বানরেরা। তাপসী মুহূর্তমধ্যে তাদের গহ্বরের বাইরে নিয়ে এসে বললেন: "ঐ দেখ বিন্ধ্যগিরি, ঐ প্রস্রবণ-শৈল, ঐ মহাসমুদ্র।" এই বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

দিগন্তবিস্তার সমুদ্র। তার ভীম গর্জনে কানে তালা লাগে, তার আকাশ-ছোঁয়া ঢেউ দেখে আতঙ্ক জাগে মনে।—সেই সমুদ্রের তীরে বিষণ্ণচিত্তে বসে আছে বানরের দল। মাস উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, আজও সন্ধান মেলেনি সীতার।

অঙ্গদ বলল: "দেখ, সুগ্রীব মুখে যতই কেন না ভাল ব্যবহার করুন আমার সঙ্গে, মনে মনে আমার উপর আক্রোশ আছে তাঁর, কারণ আমি বালীর পুত্র। মাস কেটে গেছে, অথচ সীতার সন্ধান পাইনি আমরা। এ অবস্থায় কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে গেলে সুগ্রীব অবশ্যই প্রাণবধ করবেন আমার। সুতরাং, আমি আর কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরব না—এই সমুদ্রতীরে বসে বসে অনশনে প্রাণবিসর্জন দেব।"

অঙ্গদ নীরব হয়ে বসল। তা দেখে এক হনুমান ছাড়া অন্য বানরেরাও বলল: "আমরাও কুমার অঙ্গদের সঙ্গে এখানে বসে প্রাণবিসর্জন দেব—কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরব না।"

হনুমান অনেক করে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করল অঙ্গদকে, কিন্তু কোন প্রবোধই মানল না সে।

এই সময়ে বিন্ধ্যগিরির গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছিল এক বিরাট্‌কায় পক্ষী। পাহাড়ের উপরে বসে বানরদের আলাপ শুনতে পেয়ে আনন্দিত হল সে, বলল: "ভালই হয়েছে—বানরগুলি মরলে পেট পুরে খেতে পাব আমি।"

পক্ষীটির বিরাট্‌ আকৃতি দেখে আর তার কথা শুনে আতঙ্কিত হল বানরেরা। অঙ্গদ সখেদে বলল হনুমানকে: "দেখ দেখ, কি বিপদ! সাক্ষাৎ যম এসে বসেছে আমাদের সামনে পক্ষিমূর্তি ধরে! জটায়ু পক্ষী হয়েও প্রভু রামের সেবায় প্রাণ দিলেন, অথচ আমরা কোন কাজেই লাগলাম না তাঁর।"

এ কথা শুনে পক্ষীটি বলল: "কে তোমরা আমার প্রিয় ভ্রাতা জটায়ুর মৃত্যুর কথা বলছ? সূর্যকিরণে ডানা পুড়ে গেছে আমার—ওড়ার শক্তি নেই। তোমরা আমাকে পর্বত থেকে নামিয়ে তোমাদের কাছে নিয়ে যাও, বীরগণ।"

বানররা তখন পক্ষীটিকে ধরাধরি করে পর্বত থেকে নামিয়ে নিল। অঙ্গদ তাকে সীতাহরণ জটায়ু-বধ এবং নিজেদের ব্যর্থ সীতান্বেষণের কথা জানাল।

সব শুনে পক্ষীটি বলল: "আমার নাম সম্পাতি। জটায়ু আমার ছোট ভাই। একদিন দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করার জন্য আকাশ-পথে যাত্রা করি আমরা। বেলা তখন দুপুর। সূর্যের খুব কাছ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলাম দুজনে। রৌদ্রতাপে ভাই জটায়ু অবসন্ন হয়ে পড়ল। আমি নিজের ডানা দিয়ে তাকে ঢাকি। ফলে সূর্যকিরণে আমার পাখা পুড়ে গেল—ওড়ার শক্তি হারিয়ে এই বিন্ধ্য-পর্বতের উপরে পড়ে গেলাম আমি। সেই থেকে এখানেই আছি আমি—জটায়ুর কোন সংবাদ পাইনি আর।"

এই বলে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সম্পাতি, তারপর আবার বললেন: "রাবণকে আমি জানি। শতযোজন বিস্তার ঐ সমুদ্রের ওপারে লঙ্কারাজ্য। রাবণ সেই লঙ্কার অধীশ্বর। কিছুদিন আগে তাকে দেখেছি—একটি পরমাসুন্দরী নারীকে নিয়ে আকাশ-পথ দিয়ে যাচ্ছিল সেই দুরাত্মা। ঐ রমণী 'হা রাম, হা লক্ষ্মণ' বলে আর্তনাদ করছিলেন। এখন বুঝতে পারছি: তিনিই সীতা। কি করব, ওড়ার শক্তি নেই আমার, তাই বাধা দিতে পারিনি রাবণকে।"

এই সময়ে বানরেরা আশ্চর্য হয়ে দেখল: সম্পাতির কথা শেষ হতে না হতে নতুন ডানা গজাল তাঁর!

সম্পাতি বললেন: "মহর্ষি নিশাকর আমাকে বর দিয়েছিলেন: রামের উপকার করলে নতুন পক্ষোদ্গম হবে আমার। রাবণ ও সীতার সংবাদ তোমাদের দিয়ে আমি রামের কিছু উপকার করেছি। তাই নতুন ডানা পেলাম।" এই বলে বানরদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উড়ে চলে গেলেন সম্পাতি।

রাবণের সংবাদ ত পাওয়া গেল। এখন কে আছে এমন শক্তিধর, যে এই শতযোজন বিস্তার সমুদ্র ডিঙিয়ে লঙ্কায় যাবে—নিয়ে আসবে সীতার সংবাদ?

গয় নামে এক বানর-প্রধান বলল: সে দশ যোজন ডিঙতে পারে। গবাক্ষ বলল: সে পারে বিশ যোজন। শরভ পারে ত্রিশ, ঋষভ চল্লিশ, গন্ধমাদন পঞ্চাশ, মৈন্দ ষাট, দ্বিবিধ সত্তর, সুষেণ আশি।

দলের মধ্যে সব চেয়ে বয়োবৃদ্ধ ছিল ভল্লুকপতি জাম্ববান। সে বলল: "যৌবনে আমি শতযোজনেরও বেশী ডিঙতে পারতাম। কিন্তু এখন বৃদ্ধ হয়েছি। তা নব্বই যোজন পারব।"

তখন যুবরাজ অঙ্গদ বলল: "আমি ডিঙিয়ে এক শ যোজন যেতে পারব বটে, কিন্তু ফিরে আসতে পারব কিনা জানি না।"

এ কথা শুনে জাম্ববান বলল: "বৎস, এক শ কেন, শতসহস্র যোজন অনায়াসে ডিঙিয়ে ফিরে আসতে পার তুমি। কিন্তু, বৎস, তুমি যুবরাজ—আমাদের প্রভু। আমরা থাকতে তুমি কেন যাবে সাগরলঙ্ঘন করতে?"

এই বলে হনুমানকে সম্বোধন করে জাম্ববান বলল: "বৎস হনুমান, তুমি কেন নীরব হয়ে আছ? বানরদের মধ্যে তুমি হলে শ্রেষ্ঠ বীর। সমুদ্রলঙ্ঘন ত তুচ্ছ কথা, যে কোন বীরত্বের কাজই তোমার অসাধ্য নয়। এস, বানরশ্রেষ্ঠ, সমুদ্র-লঙ্ঘন করে সীতাদেবীর সংবাদ নিয়ে এস তুমি—রামের প্রিয়কার্য সাধন কর।"

হনুমান সম্মত হল। শতযোজন বিস্তার সমুদ্র উল্লঙ্ঘনের উপযুক্ত করে সে তার শরীর ফোলাল। তারপর লাঙুল আস্ফালন করতে করতে বলল: "নিশ্চিন্ত হও তোমরা। আমি সাগর পেরিয়ে লঙ্কায় যাব, অবশ্য নিয়ে আসব সীতাদেবীর সংবাদ। ঐ মহেন্দ্র-পর্বত থেকে লাফ দিয়ে সাগরলঙ্ঘন করব আমি।"

সুন্দরকাণ্ড

হনুমানের সাগর-লঙ্ঘন

মহেন্দ্র-পর্বতে উঠে প্রথমেই সর্ব দেবতাকে বন্দনা করল হনুমান। তারপর সঙ্গীদের ডেকে সে বলল ঃ "আমি তীরবেগে যাব লঙ্কায়! সেখানে যদি সীতাদেবীকে না দেখি, তবে রাবণসমেত সমস্ত লঙ্কাপুরী উৎপাটিত করে আনব আমি।" এই বলে প্রচণ্ড বিক্রমে লাফ দিল সে।

লাফ দিয়ে মহাবেগে লঙ্কার দিকে ছুটল হনুমান। তা দেখে সমুদ্র ভাবল ঃ "সগরনন্দনেরা মৃত্তিকা খনন করেছিল বলেই না আমার এত বাড়বাড়ন্ত! রাম হলেন সগরের বংশধর। আর, এই হনুমান চলেছে রামের কার্যসাধন করতে। সুতরাং, হনুমানকে সাহায্য করা আমার উচিত।"

এই ভেবে মৈনাক-পর্বতকে সমুদ্র ডেকে বলল ঃ "মৈনাক, তুমি আমার জলে মগ্ন আছ বহুকাল। আমিই আশ্রয় দিয়ে এসেছি তোমাকে। কিন্তু আমি নিজেই যে অযোধ্যার রাজবংশের প্রজা। সেই বংশের সন্তান রাম। আজ রামের কার্যসাধন করতে চলেছে হনুমান। তুমি জল থেকে উঁচু হয়ে ওঠ, যাতে হনুমান তোমার উপরে বসে একটু বিশ্রাম করতে পারে।"

সমুদ্রের কথায় মৈনাক তৎক্ষণাৎ উঁচু হয়ে উঠল জল থেকে, হনুমানকে অনুরোধ করল তার চূড়ায় বসে একটু বিশ্রাম করতে। কিন্তু হনুমান বিশ্রাম করতে সম্মত হল না, বলল ঃ "তোমাকে ধন্যবাদ, মৈনাক। কিন্তু রামের কার্যসাধন না করে আমি থামব না!" এই বলে সে মৈনাককে হাত দিয়ে একটু স্পর্শ করেই আবার ছুটতে লাগল।

এবার দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও ঋষিদের ইচ্ছা হল : হনুমানের শক্তি পরীক্ষা করবেন। তাঁরা নাগমাতা সুরমাকে আদেশ করলেন : "হনুমানের সমুদ্র-লঙ্ঘনে বিঘ্ন জন্মাও তুমি।"

সুরমা অমনি ভীষণা এক রাক্ষসীর মূর্তি ধারণ করে হনুমানের পথরোধ করে দাঁড়ালেন। হনুমানকে তিনি বললেন : "দেবতারা তোমাকে ভক্ষণ করার অনুমতি দিয়েছেন আমাকে। অতএব, তুমি আমার মুখের মধ্যে প্রবেশ কর।"

হনুমান বললেন : "আমি রামের দূত, সীতার কাছে যাচ্ছি। তুমি যে সমুদ্রে বাস কর, সে সমুদ্র রামের প্রজা। সুতরাং, তুমি বাধা দিয়ো না আমাকে। তোমাকে কথা দিচ্ছি : কাজ সেরে ফিরে এসে তোমার মুখের মধ্যে ঢুকব আমি।"

কিন্তু হনুমানের কথায় কর্ণপাত না করে তাকে গিলতে উদ্যত হলেন সুরমা। তা দেখে হনুমান নিজের শরীর ফুলিয়ে দশ যোজন করল ; সুরমাও অমনি বিশ যোজনব্যাপী হাঁ করলেন। হনুমান তখন তার শরীর বাড়িয়ে ত্রিশ যোজন করল ; সুরমাও হাঁ করলেন চল্লিশ যোজন। ক্রমে ক্রমে হনুমান নব্বই যোজনব্যাপী কলেবর ধারণ করল, আর সুরমা হাঁ করলেন একশ যোজন। তা দেখে হনুমান নিজের দেহ মুহূর্তমধ্যে কড়ে আঙুলের মত ছোট করে ফেলল ; তারপর নাগমাতার মুখের মধ্যে ঢুকেই পরক্ষণে আবার বেরিয়ে ছুট দিল লঙ্কার দিকে। পরাস্ত হলেন নাগমাতা সুরমা।

হনুমান আরও কিছু দূর গেলে সিংহিকা নামে এক রাক্ষসী আক্রমণ করল তাকে। যে কোন জীবের ছায়া দেখেই তাকে বন্দী করতে পারত সিংহিকা। হনুমানকেও সে ঐ ভাবে ধরে ফেলল।

বিপদে পড়ে হনুমান তার শরীরটি ফুলিয়ে বিরাট্ করল।

সিংহিকাও আকাশপাতাল-জোড়া হাঁ করল। হনুমান অমনি নিজের শরীরটি কমিয়ে খুব ছোট্ট করে সিংহিকার মুখের মধ্যে ঢুকল; তারপর নখর দিয়ে রাক্ষসীর দেহ ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে এল। এমনি করে সিংহিকার জীবনান্ত করে আবার লঙ্কার দিকে ছুটল হনুমান।

অবশেষে হনুমান এসে পৌঁছল লঙ্কায়। পাছে কেউ তাকে সন্দেহ করে, এজন্য লঙ্কার মাটিতে পা দেবার আগে সে তার শরীরটি কমিয়ে খুব ছোট করে নিল।

অশোকবনে সীতা

ছোট একটি বিড়ালের মত আকার ধারণ করে লঙ্কায় প্রবেশ করল হনুমান। ত্রিকূট-পর্বতের উপরে অবস্থিত লঙ্কাপুরী দেখে চমৎকৃত হল সে।

কি অপূর্ব শোভা লঙ্কার! সুউচ্চ দুর্ভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত সমগ্র লঙ্কাপুরী। প্রাচীরের পাশে একটানা পরিখা; মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর হিংস্র সব কুম্ভীরে পূর্ণ সে পরিখা। প্রাচীরের উপরে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র সাজান। নগর-প্রবেশের সেতুগুলি এমনি কৌশলে নির্মিত যে, শত্রু তাতে পা দেওয়ামাত্র ছিটকে পড়বে পরিখার মধ্যে আর কুম্ভীরদের হাতে প্রাণ হারাবে। নগরদ্বারগুলি সব সোনার, সিঁড়িগুলি মণিময়, রাতের বেলায়ও সারা নগরী আলোয় আর জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত থাকে। ইন্দ্রের রাজধানী অমরাবতীও হার মানে লঙ্কার কাছে!

উত্তর দ্বার দিয়ে নগরমধ্যে প্রবেশ করতে উদ্যোগী হল হনুমান।

কিন্তু লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাধা দিলেন তাকে। ভয়ঙ্কর মূর্তি লঙ্কাদেবীর। ভীমরবে তিনি চপেটাঘাত করলেন হনুমানকে। লঙ্কাদেবী স্ত্রীলোক, এজন্য হনুমান তাঁর প্রাণবধ করল না—কেবল বাঁ হাত দিয়ে আস্তে ঘুষি মারল তাঁকে। তাতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

লঙ্কাদেবী তখন হনুমানকে পথ ছেড়ে দিয়ে বললেন: "বুঝলাম, কাল ঘনিয়েছে রাবণের,—সীতাকে হরণ করে নিজের ও সমস্ত রাক্ষসের মরণ ডেকে এনেছে সে। দেবাদিদেব ব্রহ্মা আমাকে বলেছিলেন যে, আমি যখন কোন বানরের হাতে পরাস্ত হব, তখনই লঙ্কার সর্বনাশ আসন্ন হবে।"

শোভাময়ী লঙ্কার মধ্যে সীতার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে হনুমান গিয়ে উপস্থিত হল রাবণের প্রাসাদে। অমন চমৎকার ভবন সে আর দেখেনি। তখন রাত্রি। রত্নখচিত স্বর্ণপালঙ্কে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছে লঙ্কেশ্বর রাবণ। কি বিরাট্ চেহারা তার—দেখলেই ভয় লাগে! হনুমানের মনেও প্রথমটা একটু ভয় জাগল।

রাবণের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে লঙ্কার বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন গৃহ তন্নতন্ন করল হনুমান। লতাগৃহ চিত্রগৃহ নিশাগৃহ,—কিছুই বাদ দিল না সে। কিন্তু কোথায় সীতা? শেষে হনুমান প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে, এমন সময়ে বড় একটি অশোকবন দেখতে পেল সে।

অশোকবনে প্রবেশ করে হনুমান দেখল: পরমাসুন্দরী এক রমণী বিষণ্ণমুখে মলিনবসনে ভূমিতলে বসে আছেন; বিকট বিকট সব রাক্ষসী তাঁকে ঘিরে আছে, নানা দুর্বাক্য বলছে। কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করছেন না তিনি—মৌন হয়ে কি যেন ভাবছেন আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন অনবরত। তাঁর বিষণ্ণ মুখ, মলিন বসন,

ধূলিধুসর দেহ ভেদ করে ফুটে বেরচ্ছে অত্যাশ্চর্য এক জ্যোতির্ময় রূপ !

শরতের হালকা মেঘে ঢাকা চন্দ্রের মত রূপময়ী ঐ রমণীকে দেখে হনুমান ভাবল ঃ এই-ই সীতা। একটি শিংশপা-বৃক্ষের পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে হনুমান একদৃষ্টে দেখতে লাগল অশোকবনে বন্দিনী নারীটিকে। ক্রমে রাত্রি শেষ হয়ে এল। এমন সময়ে রাবণ এসে উপস্থিত হল সেখানে।

রাবণকে দেখে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন সেই রমণী। রাবণ তাঁকে মিষ্ট কথায় বলল ঃ "ভয় পাচ্ছ কেন, সীতা ? আমি ত কোন অত্যাচার করিনি তোমার উপরে—করতেও চাই না। তুমি বিয়ে কর আমাকে—আমার পাটরানী হও।"

এ কথা শুনে সীতা সতেজে বললেন ঃ "অধম রাক্ষস, রামকে তুমি জান না। তাই আমাকে হরণ করতে সাহসী হয়েছ, আর এ কুপ্রস্তাব করছ। তোমার মরণ ঘনিয়েছে। শীঘ্রই রাম লঙ্কা আক্রমণ করে সবংশে নিধন করবেন তোমাকে।"

সীতার তিরস্কারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল রাবণ, বলল ঃ "অসহ্য তোমার এ অহঙ্কার, সীতা। যাক, আর দুমাস অপেক্ষা করব আমি। এর মধ্যে তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজী না হও, তবে আমার পাচকেরা তোমাকে টুকরো-টুকরো করে কেটে আমার প্রাতরাশ বানাবে।"

ক্রুদ্ধ পদবিক্ষেপে মেদিনী বিকম্পিত করে প্রস্থান করল রাবণ। যে সব চেড়ীরা সীতাকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা নানা দুর্বাক্য বলতে লাগল তাঁকে—নানা ভয় দেখাতে লাগল। এমন সময়ে ত্রিজটা নামে এক বৃদ্ধা রাক্ষসী এসে উপস্থিত হল সেখানে।

ত্রিজটার চোখে-মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা, বিষম আতঙ্ক। চেড়ীদের

সে বলল : "ওরে রাক্ষসীরা, তোরা কেউ দুর্ব্যবহার করিস না সীতার সঙ্গে। আমি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছি আজ রাত্রে। দেখেছি : রাবণ এবং লঙ্কার সব বড় বড় বীর যেন দক্ষিণ দিকে যমপুরীতে যাচ্ছেন, আর সীতাকে নিয়ে রাম উঠেছেন পুষ্পক-রথে। এতেই বুঝেছি : রাম অবশ্য সীতার উদ্ধার করবেন এবং লঙ্কার সর্বনাশ আসন্ন। ওরে মূর্খ রাক্ষসীরা, যদি বাঁচতে চাস ত ক্ষমা চা সীতার কাছে।"

ত্রিজটাকে ও চেড়ীদের অভয় দিয়ে মধুর কণ্ঠে বললেন সীতা : "ভয় নেই তোমাদের, সুদিন যদি আসে আমার, তবে তোমাদের রক্ষা করব আমি—কোন প্রতিশোধ নেব না তোমাদের দুর্ব্যবহারের।"

ত্রিজটার স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে আতঙ্কিত হল রাক্ষসীরা। একটু দূরে সরে গিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল তারা। এতে সীতার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেল হনুমান।

হনুমানের আশঙ্কা হল : হয়ত তাঁকে ছদ্মবেশী রাবণ ভেবে চিৎকার করে উঠবেন সীতা, আর সে চিৎকার শুনে আবার ছুটে আসবে রাক্ষসীরা ; তাহলে আর সীতার সঙ্গে আলাপ করা হবে না হনুমানের।

এই ভেবে শিংশপা-বৃক্ষের উপরে বসেই মৃদু মধুর স্বরে মানুষের ভাষায় বলতে লাগল হনুমান : "অযোধ্যার পুণ্যকীর্তি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম। পিতৃসত্য পালনের জন্য তিনি তাঁর পত্নী সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণকে নিয়ে বনবাসে যান। বনবাসকালে জনস্থানের বহু রাক্ষসকে বধ করেন তিনি। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে লঙ্কার রাজা রাবণ কৌশলে হরণ করে সীতাকে। রাম তখন বানরপতি সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপন করেন। বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে তিনি কিষ্কিন্ধ্যার

রাজ্য দেন। সুগ্রীব সীতার সন্ধানে চতুর্দিকে পাঠিয়েছেন বানরদের। আমি সেই বানরদেরই একজন। মনে হচ্ছে : এতদিনে সীতার দেখা পেলাম—এই শিংশপা-বৃক্ষের নিচে ঐ যে দেবীতুল্যা রমণী বসে আছেন, তিনিই সীতা।”

এ কথা শুনে সীতা চমকিত হলেন, উপরে তাকিয়ে হনুমানকে দেখতে পেলেন তিনি। হনুমান তখন গাছ থেকে নেমে এসে সীতাকে প্রণাম করে তাঁকে রামের দেওয়া আঙ্‌টিটি দিল।

আঙ্‌টিটি হাতে নিয়ে সীতা একদৃষ্টে সেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। বড় আনন্দে বড় দুঃখে তাঁর দুচোখ বেয়ে জল নামল।

রামের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন সীতা। হনুমান বলল : কুশলেই আছেন রাম-লক্ষ্মণ ; তবে সীতার অদর্শনে সর্বদাই শোকার্ত হয়ে আছেন রাম, গাছের ফলমূল ছাড়া কিছুই আহার করেন না তিনি, কেবলই সীতার জন্য বিলাপ করেন।

এ সংবাদ শুনে সীতা অশ্রুপাত করতে লাগলেন। হনুমান তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল : “কেঁদ না, দেবী। আমি ফিরে গেলেই বানরসেনা ও ভল্লুকসেনা নিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করবেন রাম। তোমার উদ্ধারের আর বিলম্ব নেই। আর, যদি আমাকে অনুমতি দাও, তবে আমি এখনই তোমাকে—শুধু তোমাকেই বা কেন, রাবণসমেত গোটা লঙ্কাপুরীই উপড়ে পিঠে বয়ে নিয়ে যেতে পারি প্রভু রামের কাছে।”

অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন সীতা—ক্ষুদ্রকায় এ বানর বলে কি! সীতার মনোভাব বুঝতে পেরে হনুমান স্বীয় কলেবর ফুলিয়ে বিশাল পর্বতের মত আকার ধারণ করল, তারপর মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল সীতাকে : “কি, এবার বিশ্বাস হল ত?”

“হ্যাঁ, মিথ্যা দম্ভ করনি তুমি” স্বীকার করলেন সীতা, “কিন্তু তুমি

যখন মহাবেগে সাগরের উপর দিয়ে যাবে, তখন হয়ত মাথা ঘুরে সমুদ্রের মধ্যে পড়ে যাব আমি। তাছাড়া, তুমি আমাকে এভাবে নিয়ে গেলে রামের কোন গৌরব হবে না ; তার চেয়ে বরং তিনি লঙ্কা আক্রমণ করে উদ্ধার করুন আমাকে,—সেই হবে তাঁর যোগ্য কাজ।"

হনুমান ভেবে দেখল ঃ ন্যায্য কথাই বলেছেন সীতা। সে তখন জনকনন্দিনীকে প্রণাম করে বিদায় নিল। যাবার আগে সীতা তাকে একটি বহুমূল্য অলঙ্কার দিলেন রামকে দেবার জন্য।

লঙ্কাদাহ ও হনুমানের প্রত্যাবর্তন

সীতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হনুমান ভাবতে লাগল ঃ "সীতার দেখা ত পেলাম, এখন আমার কর্তব্য কি ? রাক্ষসদের বলাবল জেনে যেতে পারলে মন্দ হয় না। তাতে রামের লঙ্কাবিজয়ে সুবিধা হবে।"

এই চিন্তা করে অশোকবন ধ্বংস করতে লাগল হনুমান।

যে সব রাক্ষসীরা সীতাকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা ত্রিজটার সঙ্গে আলাপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হনুমানের গাছ ভাঙার শব্দে আর পক্ষীদের আর্তনাদে জেগে উঠল তারা। হনুমানের পর্বতপ্রমাণ মূর্তি আর অদ্ভুত কাণ্ড দেখে তারা ভয় পেল, ছুটে গিয়ে সংবাদ দিল রাবণকে।

সংবাদ পেয়ে ক্রোধে জ্বলে উঠল রাবণ। তখনি আশি হাজার সশস্ত্র রাক্ষসকে পাঠিয়ে দিল সে হনুমানকে শাসন করার জন্য।

রাক্ষসদের আসতে দেখে সিংহনাদ করে উঠল হনুমান। লঙ্কার তোরণ থেকে বড় একটা হুড়কো খুলে নিল সে। সেই হুড়কোর আঘাতে সে বধ করল ঐ আশি হাজার সশস্ত্র রাক্ষসকে।

দূত ছুটে গেল রাবণের কাছে। রাবণ তখন পাঠিয়ে দিল মহাবীর জম্বুমালীকে। কিন্তু তাকেও বধ করল হনুমান। তারপর আরও অনেক রাক্ষস-সৈন্য এবং পাঁচজন সেনাপতিকে সংহার করল সে। রাবণের পুত্র মহাবীর অক্ষও প্রাণ হারাল হনুমানের হাতে।

তখন রাবণের জ্যেষ্ঠপুত্র লঙ্কার যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ এল হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। যেমন-তেমন বীর নয় ইন্দ্রজিৎ—দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজিত করেছিল সে। হনুমান মহাবিক্রমে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। শেষে ইন্দ্রজিৎ নিক্ষেপ করল অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র। কিন্তু এ অস্ত্রেও মৃত্যু হল না হনুমানের—সে বাঁধা পড়ল মাত্র!

রাক্ষসেরা তখন মহানন্দে দড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগল হনুমানকে। এতে কিন্তু উপকার হল তার, কারণ অন্য কিছু দিয়ে বাঁধলে ব্রহ্মাস্ত্রের বাঁধন আপনিই খুলে যায়। ব্রহ্মাস্ত্রের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়েও হনুমান কিন্তু চুপ করে রইল, রাক্ষসদের কোন বাধা দিল না। তার ইচ্ছা : রাক্ষসেরা তাকে রাবণের কাছে নিয়ে যাক—সে মুখোমুখী আলাপ করে আসবে লঙ্কেশ্বরের সঙ্গে।

রাক্ষসেরা হনুমানকে বেঁধে টানতে টানতে আর মারতে মারতে নিয়ে গেল রাবণের রাজসভায়।

দশানন রাবণের মূর্তি ও রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে ভাবল হনুমান : "সর্বাঙ্গে এর সুলক্ষণ; এ যদি না অধর্ম করত, তবে অধীশ্বর হতে পারত ত্রিভুবনের!"

রাবণও মুগ্ধ হল হনুমানের বিপুল বীরমূর্তি দেখে, জিজ্ঞাসা করল : "কে তুমি? কেন এসেছ লঙ্কায়? কে পাঠিয়েছে তোমাকে?"

হনুমান বলল : "আমি মহাবল রামের দূত, কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীবের আদেশে এখানে এসেছি।" তারপর রাম-সুগ্রীবের বন্ধুত্ব, বালীর নিধন, প্রভৃতি সংবাদ রাবণকে জানিয়ে বলল সে : "রাক্ষস-

রাজ, সুগ্রীব তোমাকে অনুরোধ করেছেন সীতাকে ফিরিয়ে দিতে, নইলে মহাশক্তিধর রামের হাতে তোমার পরিত্রাণ নেই। তিনি সবংশে নিধন করবেন তোমাকে, ধ্বংস করবেন এ লঙ্কাপুরী।"

হনুমান আরও বলল: "দশানন, আমি একাই পারি লঙ্কা ধ্বংস করতে, কিন্তু সুগ্রীব আমাকে সে আদেশ দেননি। যদি নিজের মঙ্গল চাও ত জানকীকে রামের কাছে ফিরিয়ে দাও।"

হনুমানের কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল রাবণ, তার প্রাণবধের আদেশ দিল।

রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণ পরম ধার্মিক। রাবণকে বাধা দিয়ে সে বলল: "মহারাজ, দূত অবধ্য। একে অন্য শাস্তি দিন, কিন্তু প্রাণবধ করা উচিত হবে না।"

রাবণ তখন আদেশ দিল: "এর লেজে আগুন দিয়ে ঘোরাও সারা লঙ্কায়। পোড়া লেজ নিয়ে এ ফিরে যাক স্বদেশে—হাসুক এর -স্বজন।"

রাবণের আদেশ শুনে উল্লসিত হল রাক্ষসেরা। তারা হনুমানের লেজে পুরু করে নেকড়া জড়াল; তারপর সে নেকড়া জব্‌জবে করে তেলে ভিজিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল হনুমানের লেজ। রাক্ষসেরা তাকে লঙ্কায় ঘোরাতে চলল।

হনুমান তার শরীর ফুলিয়ে পর্বতপ্রমাণ করেছিল। ইচ্ছে করলেই সে বন্ধনমুক্ত হয়ে নিজের লেজের আগুন নিভিয়ে বধ করতে পারত প্রহরী রাক্ষসদের। কিন্তু তা সে করল না, ভাবল: "রাক্ষসরা আমাকে সারা লঙ্কায় ঘোরায় ত মন্দ কি! আমি লঙ্কার অলিগলি চিনে যেতে পারব; তাতে রামের লঙ্কাবিজয়ে সুবিধা হবে।"

হনুমানকে লঙ্কার পথে পথে ঘোরাতে লাগল রাক্ষসেরা। সীতার কানেও এ কথা পৌঁছল। আকুল হয়ে তিনি অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে

প্রার্থনা করলেন ঃ "আমি যদি পতিব্রতা হই, তবে আগুন যেন শীতল লাগে হনুমানের—কোন ক্ষতি যেন হয় না তার।"

এদিকে হনুমানের লেজে আগুন জ্বলছে, অথচ তার কষ্ট হচ্ছে না কিছুমাত্র! "এ নিশ্চয়ই সীতার দয়া" ভাবল সে। এক ঝটকায় সে তার দেহের বাঁধন ফেলল ছিঁড়ে। তারপর লঙ্কার তোরণের একটা হুড়কো খুলে নিয়ে তার ঘায়ে সে সংহার করল রক্ষী রাক্ষসদের।

এবার সে এক নিদারুণ ধ্বংসলীলা আরম্ভ করল। লঙ্কার ভবন থেকে ভবনে লাফিয়ে পড়তে লাগল সে, আর নিজের লেজের আগুন দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগল সবগুলিতে।

জ্বলে উঠল সারা লঙ্কা। পুড়ে মরতে লাগল অসংখ্য রাক্ষস-রাক্ষসী আবালবৃদ্ধবনিতা। হাহাকার পড়ে গেল ঘরে ঘরে।

হনুমান তখন সমুদ্রজলে ডুবিয়ে তার লেজের আগুন নেভাল। এমন সময়ে তার খেয়াল হল ঃ "কি সর্বনাশ! সারা লঙ্কা ত জ্বালালাম,—কে জানে, সীতাদেবীও হয়ত পুড়ে মরলেন এ আগুনে।"

অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে অশোকবনের দিকে ছুটে চলল হনুমান। পথে সে শুনল—চারণরা বলাবলি করছে ঃ "কি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করল বানরটা। সারা লঙ্কা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, সীতার কোন ক্ষতি হয়নি!"

এ কথা শুনে আশ্বস্ত হল হনুমান। সীতার সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিল সে। তারপর সে আবার লাফ দিল সাগর ডিঙবার জন্য—কিন্তু এবার আর লঙ্কায় পৌঁছতে নয়, লঙ্কা থেকে ফিরতে।

অঙ্গদ ও অন্যান্য বানরেরা হনুমানের পথ চেয়ে বসে আছে সমুদ্রতীরে।

"জয় রাম! জয় সীতা! জয় সুগ্রীব!" ভীম গর্জন করে হনুমান এসে লাফিয়ে পড়ল তার সঙ্গীদের মধ্যে।

হনুমানের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে মহানন্দিত হল বানরেরা। উচ্চ কোলাহলে আকাশ-বাতাস মথিত করে পদভরে মেদিনী কাঁপিয়ে তারা চলল কিষ্কিন্ধ্যায়।

কিষ্কিন্ধ্যার কাছে পৌঁছে বানরেরা সব গিয়ে ঢুকল সুগ্রীবের মধুবনে। সেখানে ইচ্ছামত মধুপান করতে লাগল তারা।

সুগ্রীবের অনুমতি ছাড়া সে বনে প্রবেশের সাধ্য ছিল না কারও। বনটি পাহারা দিতেন সুগ্রীবের মাতুল দধিমুখ। তিনি বানরদের মধুপান করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু বানরেরা তাঁর কথা ত শুনলই না, উপরন্তু উপহাস করে গালি দিয়ে ভেঙ্‌চি কেটে রীতিমত অপমান করল তাঁকে। দধিমুখ তখন তাঁর অনুচরদের নিয়ে আক্রমণ করল অবাধ্য বানরদের। কিন্তু বানরদের প্রহারের চোটে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ল অনুচরেরা, আর অঙ্গদ ত তার দাদামশাই দধিমুখকে একেবারে ধরাশায়ী করে ছাড়ল।

অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় দধিমুখ ছুটে গেলেন সুগ্রীবের কাছে। সব শুনে সুগ্রীব বললেন: "নিশ্চয়ই সীতার সন্ধান পেয়েছে ওরা, নচেৎ মাস উত্তীর্ণ করে ফেরা সত্ত্বেও এমন উন্মত্তের মত মধুবনে উৎপাত করতে সাহসী হত না।"

সুগ্রীবের আদেশে তাঁর কাছে অঙ্গদ হনুমান প্রভৃতিকে সসম্মানে নিয়ে আসা হল। তারা এসে প্রণাম করল রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে।

লঙ্কার ও সীতার সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে হনুমান সীতার দেওয়া মণিটি রামকে দিল। মণিটি হাতে নিয়ে বারংবার সেটি দেখতে লাগলেন রাম; তাঁর চোখের জল আর বাধা মানল না।
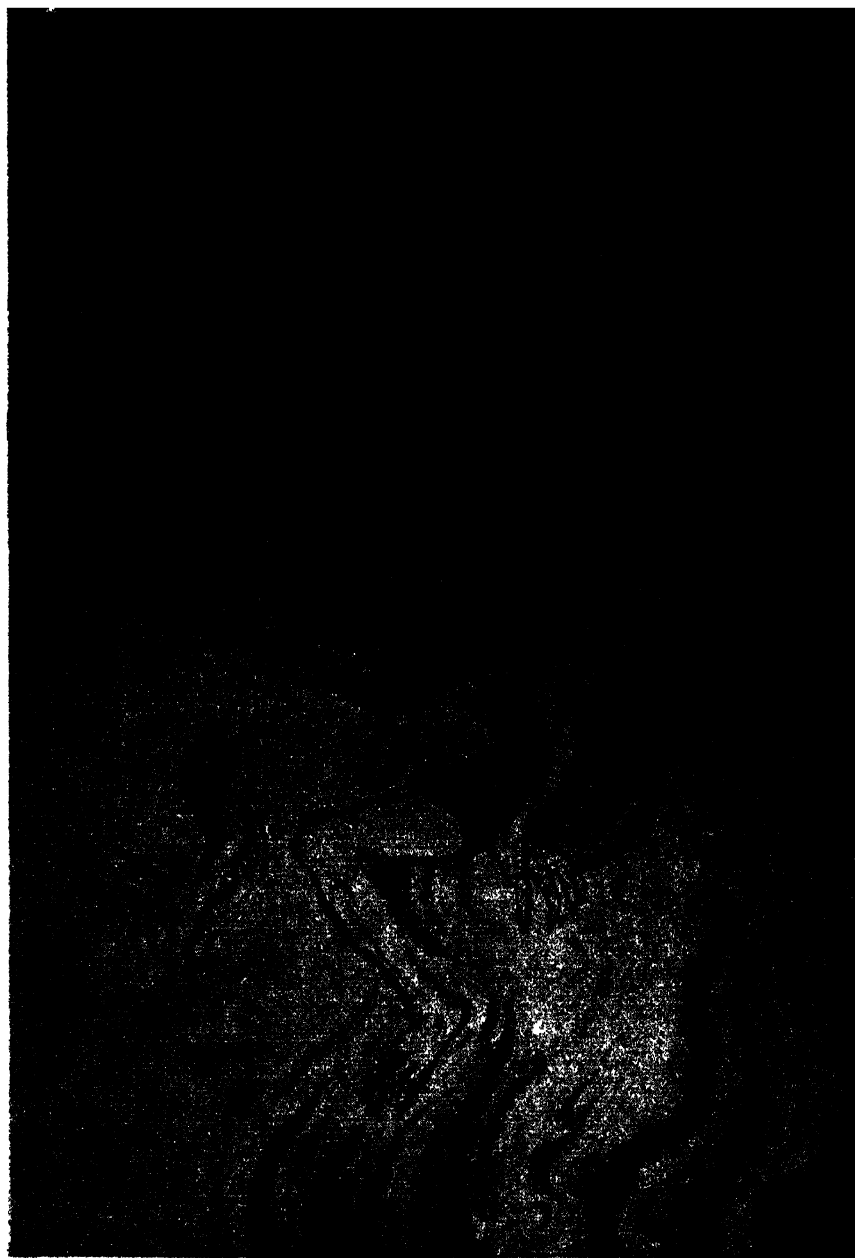
যুদ্ধকাণ্ড

বিভীষণের রামপক্ষে যোগদান

বিপুল বানরসেনা ও ভল্লুকবাহিনী নিয়ে লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করলেন রাম।

কিষ্কিন্ধ্যা থেকে লঙ্কা ত আর কম দূর নয়। পথও বেশ দুর্গম, শত্রুভয়ও আছে। তাছাড়া, এই দীর্ঘ পথে ঐ বিপুল বাহিনীর জন্য পর্যাপ্ত ফলজল চাই।

তাই রামের আদেশে লক্ষ বানর সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলল বানর-যূথপতি নীল পথ দেখাতে দেখাতে। তারপর নিজ নিজ দলবল নিয়ে চলল গজ গবয় ও গবাক্ষ। বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বে চলল ঋষভ সদলে, আর বাম পার্শ্বে গন্ধমাদন। রাম-লক্ষ্মণ রইলেন বাহিনীর মধ্যভাগে—রাম হনুমানের কাঁধে, আর অঙ্গদের কাঁধে লক্ষ্মণ। জাম্ববান সুষেণ ও বেগদর্শী বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করতে করতে চলল।

ক্রমে সমগ্র বাহিনী সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়ে শিবির স্থাপন করল। সমুদ্রের বুকে জলের ঢেউ, আর সমুদ্রের তীরে রাম-বাহিনীর ঢেউ,—দুই-ই অসংখ্য!

রামের আগমন-সংবাদ পেতে বিলম্ব হল না রাবণের। একেই ত হনুমানের কীর্তিকলাপে জ্বালা ধরে গিয়েছিল তার অন্তরে, তার উপরে আবার রামের সসৈন্যে আগমন। নাঃ, আগে থাকতেই সাবধান হতে হয়। তাই আত্মীয়-স্বজন পাত্রমিত্র নিয়ে মন্ত্রণায় বসল লঙ্কেশ্বর।

লঙ্কার প্রধান সেনাপতি প্রহস্ত এবং অন্যান্য সেনাপতিরা রাবণের

মনস্তুষ্টি করে বলল ঃ "চিন্তিত হবেন না, মহারাজ। ত্রিলোকবিজয়ী বীর আপনি, আপনার পুত্র যুবরাজ ইন্দ্রজিতের কাছে দেবরাজ ইন্দ্রও পরাজিত হয়েছেন ; তার উপর আমরাও আছি। সুতরাং, কি ভয় ? রাম-লক্ষ্মণকে সসৈন্যে বধ করতে কতক্ষণই বা লাগবে আমাদের ? নিশ্চিন্ত হয়ে যুদ্ধের আয়োজন করুন আপনি।"

কুমার ইন্দ্রজিৎও অনুরূপ মত প্রকাশ করল।

এদের কথায় প্রতিবাদ করল রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর ধার্মিক বিভীষণ। সে বলল ঃ "মহারাজ, মূর্খের মত কুপরামর্শ দিচ্ছে আপনার সেনাপতিরা। রামের শক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করবেন না। জনস্থানের সমস্ত রাক্ষস বধ করেছে সে ; তার অনুচর হনুমান সাগর লঙ্ঘন করে এসেছে লঙ্কায়। এমন প্রবল ব্যক্তির সঙ্গে অকারণে শত্রুতা করা উচিত নয়।"

বিভীষণের কথা শুনে ক্রমেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল রাবণ। বিভীষণ তবু বলতে লাগল ঃ "রাম কোন অপরাধ করেনি। তার পত্নীকে হরণ করে অন্যায় করেছেন আপনি। মহারাজ, সীতাকে ফিরিয়ে দিন, নইলে সবংশে বিনষ্ট হবেন আপনি, লঙ্কাপুরীও ধ্বংস হবে।"

বিভীষণের কথা আর সহ্য করতে পারল না রাবণ—ক্রোধভরে সভা ছেড়ে উঠে গেল সে।

পরদিন প্রত্যুষে বিভীষণ আবার অনুরোধ করল রাবণকে সীতাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু রাবণ সম্মত হল না, সদম্ভে বলল ঃ "রাম কখনই ফিরে পাবে না জানকীকে। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে নিয়েও সে যদি আসে, তবু সে পরাস্ত হবে আমার কাছে।"

এই বলে রাবণ তার মধ্যম ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের মতামত জানতে চাইল। কুম্ভকর্ণের চেহারা যেমন বিরাট, শক্তিও তেমনি অলৌকিক।

জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সে এক হাজার প্রজাকে খেয়ে ফেলে। দেবাদিদেব ব্রহ্মা তাই কৌশল করে বরের নামে এক নিদারুণ অভিশাপ দেন তাকে। সে অভিশাপের ফলে কুম্ভকর্ণ ছ মাস ধরে একটানা ঘুমত, তারপর মাত্র একদিনের জন্য জাগত। আজ ছিল কুম্ভকর্ণের জাগার দিন।

কুম্ভকর্ণও রাবণের সীতাহরণ সমর্থন করল না, বলল : "মহারাজ, সীতাকে হরণ করা অতি অযোগ্য কাজ হয়েছে তোমার পক্ষে। চরম অন্যায় করেছ তুমি, রাম যে তোমাকে এত দিন বধ করেনি, এই তোমার ভাগ্য। যাক, অন্যায় যখন করে ফেলেছ তুমি, তখন আমি প্রাণপণে শত্রুসংহার করে তোমাকে রক্ষা করব।"

বিভীষণ তখন আবারও অনুরোধ করল রাবণকে সীতাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য।

এবার কুমার ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে বলল : "তাত, আপনি ভীরু। তাই বারংবার এমন পরামর্শ দিচ্ছেন। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রকেও বাহুবলে পরাজিত করেছি আমি—রাম-লক্ষ্মণ কোন্ ছার!"

বিভীষণ উত্তরে বলল : "তুমি অল্পবুদ্ধি বালক, তাই এমন প্রলাপ বকছ। তোমার এ অহঙ্কারের ফলে ধ্বংস হবে রাক্ষসবংশ—ধ্বংস হবে স্বর্ণলঙ্কা।"

রাবণ এবার বিষম ক্রুদ্ধ হল বিভীষণের উপর, বলল : "তুমি আমার ভাই হয়েও বারংবার শত্রু রামের বলবীর্যের প্রশংসা করছ। দেইজী শত্রু তুমি! আমার বলবিক্রম আর যশখ্যাতিতে ঈর্ষ্যা জেগেছে তোমার মনে। অন্য কেউ তোমার মত আচরণ করলে এতক্ষণ বধ করতাম তাকে। কুলাঙ্গার, তোমাকে ধিক্!"

রাবণের এ অপমানকর বাক্যে বিভীষণও ক্রুদ্ধ হল। সে

গদাহস্তে চারজন অনুচর নিয়ে তখনি রাবণের সভা ত্যাগ করে চলল রামের সঙ্গে যোগ দিতে।

অনুচর চারজনের সঙ্গে সমুদ্র পেরিয়ে বিভীষণ গিয়ে পৌঁছল রামের শিবিরে। সুগ্রীব ত প্রথমে বধ করতেই যাচ্ছিলেন তাকে, কিন্তু রাম বাধা দিলেন। তিনি বিভীষণকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বললেন।

বিভীষণ এসে লুটিয়ে পড়ল রামের পায়ে; বলল সেঃ "লঙ্কেশ্বরের কাছে অপমানিত হয়ে শরণ নিতে এসেছি আপনার কাছে। লঙ্কাজয়ে ও রাবণবধে আপনাকে সাহায্য করব আমি।"

রাম বললেনঃ "বিভীষণ, আমি রাবণকে বধ করে তোমাকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাব।"

তখনি রামের আদেশে সমুদ্রজল আনিয়ে বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করলেন লক্ষ্মণ।

সেতুবন্ধন

এবার রাম পরামর্শ করতে লাগলেনঃ সসৈন্যে এই শতযোজন-বিস্তার সমুদ্র পার হওয়ার উপায় কি ?

বিভীষণ বললঃ "সমুদ্রের শরণ নিন আপনি। আপনারই পূর্ব-পুরুষ সগররাজার পুত্রেরা পৃথিবী খনন করেছিলেন বলেই না সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। সে কথা স্মরণ করে সমুদ্র অবশ্যই সাহায্য করবে আপনাকে।"

বিভীষণের পরামর্শ শুনে রাম তখনই কুশাসনে বসে সমুদ্রের আরাধনা আরম্ভ করলেন।

এমন সময়ে রাবণের আজ্ঞায় শুক নামে তার এক মন্ত্রী পক্ষিরূপ ধরে এল সুগ্রীবের কাছে। রাবণের নির্দেশমত সুগ্রীবকে সে বলল ঃ "বানরপতি, তুমি রাবণের ভ্রাতৃসম। রাম তোমার কে? সীতা-হরণে তোমার কি ক্ষতি? এ যুদ্ধে কোনই লাভালাভ নেই তোমার। তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে যাও।"

শুকের কথা শুনে বানরেরা শূন্যে লাফিয়ে উঠে তাকে ধরল, তারপর প্রহারের চোটে মেরে ফেলার উপক্রম করল তাকে। কিন্তু রামা বাধা দিলেন, বললেন ঃ "দূত অবধ্য—ছেড়ে দাও একে।" ফলে, শুকের প্রাণ বাঁচল।

তিন দিন তিন রাত্রি ধরে সমুদ্রের আরাধনা করলেন রাম। সমুদ্র তবু দেখা দিলেন না তাঁকে। রাম তখন ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে সরোষে বললেন ঃ "অকৃতজ্ঞ সমুদ্র, আজ আমি শরাঘাতে শুকিয়ে ফেলব তোমাকে।"

রামের শরাঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল সমুদ্রের জল, প্রাণভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল সামুদ্রিক প্রাণীরা। স্বয়ং সমুদ্র উজ্জ্বল মূর্তি ধারণ করে করজোড়ে এসে দাঁড়ালেন রামের সামনে।

রামকে বললেন সমুদ্র ঃ "রাম, প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলতে হয় আমাকে। তাই আমার জলরাশি সরিয়ে নিয়ে পথ করে দিতে পারি না তোমার বাহিনীকে। কি ভাবে তোমার বাহিনী এই শতযোজন-বিস্তার জলরাশি পার হবে, শোন। তোমরা যেখান থেকে পার হবে, সেখানে স্থির হয়ে থাকব আমি—কোন তরঙ্গই থাকবে না সেখানে। কপিপ্রধান নীল আছে তোমার বাহিনীতে। সে হল দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার বরপুত্র। স্থপতিবিদ্যায় সে অদ্বিতীয়। জলরাশির উপরে সেতু নির্মাণ করবে সে। সেই সেতু দিয়ে লঙ্কায় পৌঁছবে তোমরা।"

সমুদ্র অন্তর্হিত হলেন। রামের অনুরোধে সমুদ্রবক্ষে সেতুবন্ধন-কার্য আরম্ভ করল নীল। তার নির্দেশে অসংখ্য বানর অগনতি বড় বড় গাছ-পাথর নিয়ে এল। সেই সমস্ত দিয়ে পাঁচ দিনের মধ্যে বিস্ময়কর এক সেতু নির্মাণ করল নীল। সেতুটি দৈর্ঘ্যে একশ যোজন, প্রস্থে দশ যোজন।

সেই সেতুর উপর দিয়ে কোটি কোটি বানর-সেনা ও ভল্লুক-সেনা নিয়ে লঙ্কায় পৌঁছলেন রাম-লক্ষ্মণ।

রামের মায়ামুণ্ড

এদিকে শুকের মুখে সেতুবন্ধন এবং রামের সসৈন্যে লঙ্কায় আগমনের সংবাদ পেল রাবণ। তখন সে রামের বাহিনীর বলাবল জানার জন্য গুপ্তচররূপে পাঠিয়ে দিল মন্ত্রী শুক ও সারণকে।

মন্ত্রী দুজন বানরের মূর্তি ধারণ করে রামের শিবিরে গেল। কিন্তু বিভীষণের অনুচরদের ফাঁকি দিতে পারল না তারা। শুক-সারণকে ধরে তারা নিয়ে গেল রামের কাছে।

রাম কিন্তু তাদের ছেড়ে দিলেন। সহাস্যে তিনি তাদের বললেন ঃ "তোমরা ইচ্ছামত আমার শিবির পরিদর্শন করে যাও। আর, রাবণকে বলো ঃ সে চোরের মত হরণ করে এনেছে সীতাকে ; কাল থেকে তার দুষ্কর্মের শাস্তি আরম্ভ হবে—আমার বাণে কাঁপবে সারা লঙ্কা।"

রামের মহত্ত্বে মুগ্ধ হল শুক-সারণ। শঙ্কিত চিত্তে তাঁর শিবির পরিদর্শন করে রাবণের কাছে ফিরে গেল তারা। রামের বলাবলের বর্ণনা দিয়ে রাবণকে তারা বলল ঃ "মহারাজ, বিপুল বাহিনী রামের। অপরিমেয় তার শক্তি। সীতাকে আপনি ফিরিয়ে দিন—মিটিয়ে

ফেলুন এ সর্বনাশা বিরোধ। নইলে মঙ্গল নেই আপনার—মঙ্গল নেই লঙ্কার।”

এ কথা শুনে শুক-সারণের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হল রাবণ। “কি! আমার সামনে এসে আমারই শত্রুর প্রশংসা! দূর হয়ে যাও তোমরা” এই বলে সে তার দশ আননের বিশ নয়ন লাল করে তাড়িয়ে দিল শুক-সারণকে।

শুক-সারণ নতশিরে বিষণ্ণমুখে চলে গেল।

রাবণ কিন্তু মুখে দম্ভ করলেও ভারী উদ্বিগ্ন হল মনে-মনে। বিদ্যুৎজিহ্ব নামে এক মায়াবী রাক্ষসকে ডাকিয়ে আনাল সে। তাকে দিয়ে সে তৈরী করাল এক নরমুণ্ড আর বৃহৎ এক ধনুর্বাণ। সে মুণ্ড সে ধনুর্বাণ দেখতে অবিকল রামের মত।

তারপর বিদ্যুৎজিহ্বকে নিয়ে রাবণ গেল অশোকবনে। সেখানে গিয়ে সীতাকে সে বলল: “কার জন্য আর অপেক্ষা করছ, জানকী? রাম আর নেই এ পৃথিবীতে। কাল রাত্রে সে যখন সসৈন্যে ঘুমচ্ছিল তার শিবিরে, তখন আমার সৈন্যেরা গিয়ে আক্রমণ করে। সে আক্রমণে হনুমান এবং অনেক বানর ও ভল্লুক প্রাণ হারিয়েছে, লক্ষ্মণ পালিয়ে গেছে, বিভীষণ হয়েছে বন্দী। আর রাম—”

একটু যেন ঢোক গিলল রাবণ, তারপর বলল: “রামকে বধ করেছে আমার সৈন্যেরা—মাথা কেটে এনেছে তার।”

এই বলে এক রাক্ষসীকে আদেশ করল দশানন: “যা, বিদ্যুৎজিহ্বকে ডেকে আন। রামের কাটা মুণ্ড এনে সে দেখাক সীতাকে।”

বিদ্যুৎজিহ্ব এসে রামের মায়ামুণ্ড ও নকল ধনুর্বাণ রাখল সীতার সামনে। সেগুলি দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন সীতা, তারপর চেতনা ফিরে পেয়ে হাহাকার করে বিলাপ করতে লাগলেন।

এমন সময়ে একজন দ্বারপাল এসে রাবণকে জানাল যে, সেনাপতি প্রহস্ত দেখা করতে চান লঙ্কেশ্বরের সঙ্গে। রাবণ তখনই প্রস্থান করল, আর সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেল রামের মায়ামুণ্ড ও ধনুর্বাণ।

রাবণ চলে গেলে সীতার কাছে এল সরমা। বিভীষণের পত্নী সে, রাবণের আদেশে রক্ষা করছিল সীতাকে।

সীতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল সরমা: "শান্ত হও, দেবী। রাম মরেননি। তুমি যা দেখেছ, তা হল রামের মায়ামুণ্ড আর মায়া-ধনুর্বাণ। প্রকৃতপক্ষে রাম সসৈন্যে সুস্থ আছেন। তাঁর বিপুল বাহিনী দেখে আতঙ্ক জেগেছে লঙ্কেশ্বরের মনে। ঐ শোন, রামের বানরবাহিনী ও ভল্লুক-সেনার সিংহনাদ।"

সত্যই তখন বানর ও ভল্লুকদের সিংহনাদে কেঁপে উঠল লঙ্কাপুরী।

নাগপাশে রাম-লক্ষ্মণ

রাবণ সীতার কাছ থেকে ফিরে এলে, তার মা এবং লঙ্কার প্রবীণ মন্ত্রিগণ তাকে উপদেশ দিলেন সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে রামের সঙ্গে বিরোধ দূর করতে। কিন্তু সে উপদেশে কর্ণপাত করল না সে।

আবার বানর ও ভল্লুকদের সিংহনাদে কেঁপে উঠল স্বর্ণলঙ্কা।

রাবণের মাতামহ মাল্যবান দৌহিত্রকে বললেন: "দশানন, জানকীকে ফিরিয়ে দাও তুমি। রামের সঙ্গে বিরোধ করো না। তুমি নানা অধর্ম করে আসছ চিরকাল। অবশেষে চরম অন্যায় করেছ সীতাকে হরণ করে। আমি বহু দুর্লক্ষণ দেখছি লঙ্কায়—আকাশ থেকে বৃষ্টির পরিবর্তে রক্ত ঝরছে, হাতি ও ঘোড়া কাঁদছে, শেয়াল ও শকুনের দল ভীষণ চিৎকার করছে, পূজার ভোগ ছুঁয়ে

ফেলছে কুকুরে, কালপুরুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরে ঘরে। বৎস রাবণ, বন্ধ কর এ যুদ্ধ।"

কিন্তু 'চোরা নাহি শুনে ধর্মের কাহিনী'! মাতামহকে অপমানকর ভাষায় কঠোর তিরস্কার করল রাবণ। পরম বিজ্ঞ মাল্যবান লজ্জায় ক্ষোভে মুখ কাল করে প্রস্থান করলেন।

রাবণ তখন লঙ্কাপুরী রক্ষার ব্যবস্থা করল। তার আদেশে সেনাপতি প্রহস্ত পুরীর পূর্ব দ্বার, মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণ দ্বার এবং যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম দ্বার রক্ষার ভার নিল; আর উত্তর দ্বারের ভার নিল স্বয়ং রাবণ; লঙ্কার মধ্যভাগ রক্ষার ভার পড়ল বিরূপাক্ষের উপর।

এদিকে রামও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলেন না। বিভীষণের চার অনুচর গোপনে লঙ্কায় প্রবেশ করে সেখানকার সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে এনেছিল। লঙ্কারক্ষার ব্যবস্থা শুনে রামও তাঁর বাহিনী নিয়ে ব্যূহ রচনা করলেন।

রামের আদেশে বানর-বীর নীল গেল লঙ্কার পূর্ব দ্বারে প্রহস্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, দক্ষিণ দ্বার আক্রমণের ভার নিল অঙ্গদ, পশ্চিম দ্বারে গেল হনুমান, আর লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং রাম গেলেন উত্তর দ্বারে লঙ্কেশ্বর রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। লঙ্কার মধ্যস্থল আক্রমণের ভার পড়ল সুগ্রীব জাম্ববান ও বিভীষণের উপর।

পরদিন সুগ্রীব ও অন্যান্যদের নিয়ে সুবেল-পর্বতের উপর থেকে লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণ করতে লাগলেন রাম। সহসা সুগ্রীব লঙ্কার গোপুরের শীর্ষে স্বয়ং রাবণকে দেখতে পেলেন। অমনি তিনি প্রচণ্ড লাফ দিয়ে আক্রমণ করলেন লঙ্কেশ্বরকে।

দশাননের মুকুট কেড়ে নিয়ে ভূতলে ফেলে দিলেন সুগ্রীব।

তারপর রাবণের সঙ্গে প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল তাঁর। রাবণ শীঘ্রই বিপর্যস্ত হয়ে উঠল। সে তখন মায়াযুদ্ধ করার উপক্রম করল। সুগ্রীব তা বুঝতে পেরে এক লম্ফে ফিরে এলেন রামের কাছে।

সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করে রাম বললেন: "আশ্চর্য তোমার সাহস, বন্ধু, অতুলন তোমার শক্তি। কিন্তু আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে এ কাজ করা উচিত হয়নি তোমার। যদি তোমার কোন বিপদ্ ঘটত, তবে কি লাভ হত আমার সীতাকে ফিরে পেয়ে?"

তারপর রাম অঙ্গদকে পাঠিয়ে দিলেন রাবণের কাছে। আকাশ-পথে অঙ্গদ গিয়ে উপস্থিত হল রাবণের সভায় মূর্তিমান্ অগ্নির মত।

পাত্রমিত্র নিয়ে সভা জাঁকিয়ে বসে আছে রাবণ। অঙ্গদ তাকে বলল: "আমি বালিপুত্র অঙ্গদ, কোশলরাজ রামের দূত আমি। তুমি চোরের মত লুকিয়ে আছ কেন? বেরিয়ে এস, যুদ্ধ কর রামের সঙ্গে। তিনি সবংশে নিধন করবেন তোমাকে—বিভীষণকে বসাবেন লঙ্কার সিংহাসনে। আর, যদি বাঁচতে চাও, তবে হীনতা স্বীকার করে সীতাকে ফিরিয়ে দাও রামের কাছে।"

অঙ্গদের কথা শুনে দারুণ রুষ্ট হল রাবণ। সে তার সচিবদের আজ্ঞা দিল অঙ্গদকে বধ করতে। চারজন রাক্ষস অঙ্গদকে আক্রমণ করল। অঙ্গদ তাদের ধরে লাফ দিয়ে প্রাসাদচূড়ায় উঠল, তারপর সেখান থেকে নিচে নিক্ষেপ করল তাদের; রাক্ষসেরা প্রাণ হারাল। অঙ্গদ তখন প্রাসাদশিখর চূর্ণ করে ফিরে গেল রামের কাছে।

অঙ্গদ ফিরে গেলে রাক্ষস-সৈন্য আক্রমণ করল রামের বাহিনীকে। তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হল উভয় পক্ষে।

ইন্দ্রজিৎ প্রকাণ্ড গদা দিয়ে আঘাত করল অঙ্গদকে। অঙ্গদ সেই

গদা কেড়ে নিয়ে তারই আঘাতে ইন্দ্রজিতের রথ অশ্ব ও সারথিকে বিনষ্ট করল।

লঙ্কার সেনাপতি জম্বুমালীকে বধ করল হনুমান। সুগ্রীব একটা বিশাল গাছ উপড়ে নিয়ে আঘাত করল প্রঘসকে ; সে আঘাতে প্রাণ হারাল প্রঘস। বিরূপাক্ষকে বধ করলেন লক্ষ্মণ। রামের বাণে চারজন মহাবীর রাক্ষসের মাথা কাটা গেল। নীল নিকুম্ভের সারথিকে বধ করল, আর বানর-বীর সুষেণ বধ করলেন বিদ্যুন্মালীকে।

তখন সূর্য অস্ত গেল। আরম্ভ হল নিশাযুদ্ধ। রামের বাণে অস্থির হয়ে লঙ্কার সেনাপতিরা প্রাণ নিয়ে পালাল। অঙ্গদের হাতে পরাস্ত হল ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রজিৎ বুঝল যে, সম্মুখ-যুদ্ধে জয়লাভের আশা নেই রাক্ষসদের। তাই সে আরম্ভ করল মায়াযুদ্ধ। আকাশে অদৃশ্য হয়ে যুদ্ধ করতে পারত সে ; তখন কেউ দেখতে পেত না তাকে।

অদৃশ্য ইন্দ্রজিতের শরাঘাতে অস্থির হয়ে উঠলেন রাম-লক্ষ্মণ। শেষ পর্যন্ত সে নিক্ষেপ করল নাগপাশ-অস্ত্র। সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করতে না করতেই বড় বড় মহাসর্প এসে রজ্জুর মত বেঁধে ফেলল রাম-লক্ষ্মণকে। নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলেন তাঁরা। মরণের কাল ছায়া নেমে এল তাঁদের চোখে।

রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বেঁধে ইন্দ্রজিৎ সহর্ষে রণক্ষেত্র ত্যাগ করল। সংবাদ শুনে রাবণ ত মহানন্দিত। বিজয়-বাদ্য বেজে উঠল সারা লঙ্কায়।

এদিকে রাম-লক্ষ্মণকে মুমূর্ষু দেখে শোকে ভয়ে হতাশায় অভিভূত হয়ে পড়ল বানরেরা। বিভীষণ তাদের সান্ত্বনা দিয়ে ফিরতে লাগল।

এমন সময়ে আকাশ-পথে ভীমবেগে উড়ে এলেন পক্ষিকুলপতি

গরুড়। বিরাট্ আকার তাঁর—সর্পকুলের প্রবল শত্রু তিনি। যে সমস্ত মহানাগ রাম-লক্ষ্মণকে করাল বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল, তারা গরুড়কে দেখামাত্র প্রাণভয়ে পলায়ন করল। রাম-লক্ষ্মণ মুক্ত হলেন নাগ-পাশের বন্ধন থেকে।

রাম তখন ধন্যবাদ দিলেন গরুড়কে। গরুড় রামকে আলিঙ্গন ও প্রদক্ষিণ করে বিদায় নিলেন।

রাম-লক্ষ্মণকে সুস্থ হতে দেখে পরম হর্ষে আত্মহারা হয়ে উঠল বানর ও ভল্লুকেরা—মেঘগর্জনের মত তুমুল সিংহনাদ করে উঠল তারা।

রাবণের পরাজয়

রাম-বাহিনীর সিংহনাদ শুনে চমকিত হল রাবণঃ একি! আবার সিংহনাদ করে কেন বানর ও ভল্লুকেরা?

রাবণের আদেশে কয়েকজন রাক্ষস গিয়ে প্রকৃত ব্যাপার জেনে এল। রাম-লক্ষ্মণ নাগপাশের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন শুনে রাবণ উৎকণ্ঠিত হয়ে আবার তার সেনাপতিদের যুদ্ধে পাঠাল।

একে একে যুদ্ধে প্রাণ হারাল লঙ্কার সেনাপতিরা। সেনাপতি ধূম্রাক্ষ বহু বানর বধ করে শেষে হনুমানের হাতে প্রাণ দিল। অঙ্গদ খড়্গাঘাতে শিরশ্ছেদ করল সেনাপতি বজ্রদংষ্ট্রের। এরপর মহাবীর অকম্পনকে বধ করল হনুমান। সর্বশেষে যুদ্ধে এল লঙ্কার প্রধান সেনাপতি প্রহস্ত। বহু বানর-সেনাকে বধ করল সে। কিন্তু অবশেষে নীল তাকে সংহার করল।

প্রহস্ত নিহত হলে রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে এল। বিষম বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগল দশানন। সুগ্রীব সুষেণ নল গবয় গবাক্ষ প্রভৃতি

বানরপ্রধানরা পরাজিত হল তার হাতে। অসংখ্য বানর ও ভল্লুক আহত বা নিহত হল তার বাণে।

তখন হনুমান মহাবিক্রমে আক্রমণ করল লঙ্কেশ্বরকে। তুজন তুজনকে চড় কিল ঘুষি মেরে অস্থির করে তুলল। শেষে রাবণের মুষ্টিপ্রহারে বিহ্বল হয়ে পড়ল হনুমান। তা দেখে নীল এগিয়ে এসে আক্রমণ করল রাবণকে। কিন্তু সেও রাবণের বাণে অচেতন হয়ে পড়ল।

তখন যুদ্ধ বাধল রাবণে আর লক্ষ্মণে। তারা পরস্পরকে লক্ষ্য করে আগুনের মত সব ভয়ঙ্কর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। অবশেষে তুর্জয় রাবণ তুর্বার এক শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করল লক্ষ্মণের প্রতি। সেই শক্তিশেল এসে বজ্রের মত বিঁধল লক্ষ্মণের বুকে; হতচেতন হয়ে পড়ে গেলেন তিনি।

রাবণ তু হাত দিয়ে লক্ষ্মণের অচেতন দেহটি তুলতে গেল: কিন্তু বিষ্ণুর অংশে জন্ম লক্ষ্মণের; তাই কিছুতেই তাঁকে তুলতে পারল না সে।

এমন সময়ে হনুমান ছুটে এসে বিষম মুষ্টিপ্রহার করল রাবণের বুকে। সে মুষ্টিপ্রহারে রাবণ ঘুরে পড়ে অচেতন হয়ে গেল। হনুমান তখন লক্ষ্মণকে কোলে তুলে নিয়ে গেল রামের কাছে। বানরদের শুশ্রূষায় লক্ষ্মণ শীঘ্রই সুস্থ হলেন।

ইতোমধ্যে রাবণেরও চেতনা ফিরে এল। আবার প্রচণ্ড বিক্রমে বানর বধ করতে লাগল সে। তা দেখে হনুমানের পিঠে চড়ে রাম যুদ্ধ করতে এলেন তার সঙ্গে। রামের বাণে শীঘ্রই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল সে। তার অশ্ব ও সারথি প্রাণ হারাল, টুকরো টুকরো হয়ে গেল তার রথ শূল ও খড়্গ। শেষে রাবণ বিহ্বল হয়ে পড়ল—তার হাতের ধনুঃ পড়ল খসে।

রাম তখন তীক্ষ্ণ বাণে রাবণের মুকুট কেটে ফেলে বললেন ঃ "রাবণ, তুমি আজ ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়েছ। তুমি যাও, বিশ্রাম কর গিয়ে লঙ্কায়। সুস্থ হয়ে আবার যুদ্ধ করো আমার সঙ্গে।"

কুম্ভকর্ণ-বধ

রামের হাতে পরাজিত হয়ে ক্ষুব্ধচিত্তে লঙ্কাপুরে ফিরে এল রাবণ। সভাসদ্‌দের বলল সে ঃ "দেখ, ব্রহ্মা আমাকে বলেছিলেন যে, মানুষের হাতেই আমার জীবনাশঙ্কা—নচেৎ অন্য কোন প্রাণী বধ করতে পারবে না আমাকে। মনে হচ্ছে, দাশরথি রামই সেই মানুষ। যাহোক, কুম্ভকর্ণের সাহায্য ছাড়া এ সঙ্কটে আমাদের আর নিস্তার নেই। ব্রহ্মার শাপে সে এখন নিদ্রামগ্ন। তোমরা যাও, তার নিদ্রাভঙ্গ কর গে।"

বিশাল এক গুহার মত আবাসে নিদ্রা যেত কুম্ভকর্ণ। রাবণের আদেশ পেয়ে রাক্ষসেরা উত্তম উত্তম ভোজ্য গন্ধদ্রব্য ও মাল্য নিয়ে গেল কুম্ভকর্ণের ভবনে।

বিরাট্ এক পর্বতের মত শুয়ে আছে কুম্ভকর্ণ। প্রবল বেগে তার নিঃশ্বাস বইছে। রাক্ষসেরা তার কাছে যেতেই ছিটকে পড়তে লাগল সেই বিষম নিঃশ্বাসের ধাক্কায়।

ঘুম ভাঙলেই কুম্ভকর্ণ আহার ও পানীয় চাইবে। রাক্ষসেরা তাই অসংখ্য মৃগ মহিষ ও বরাহের মাংস এনে থরে থরে সাজিয়ে রাখল তার সামনে, আর রাখল শোণিতে পূর্ণ অনেকগুলি কলসী। তারপর তার সর্বাঙ্গে চন্দন লেপন করে তাকে মালা পরিয়ে দেওয়া হল।

এবার কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার জন্য নানা প্রক্রিয়া আরম্ভ করল

রাক্ষসেরা। কয়েকজনে মিলে তার কানের কাছে তুমুল চিৎকার করতে লাগল, অন্য কয়েকজনে পাথর মুগুর ও গদা নিয়ে সবলে পিটতে লাগল তাকে, কেউ বা মারতে লাগল ঘুষি। কিন্তু কিছুতেই ঘুম ভাঙল না তার। তখন তারা অনেকগুলি ঘোড়া উট ও হাতি এনে তুলে দিল তার দেহের উপর, আর প্রচণ্ড রবে ভেরী শঙ্খ মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাজাতে লাগল। তবু ঘুম ভাঙে না কুম্ভকর্ণের। তখন হাজার হাতিকে একসঙ্গে উঠিয়ে দেওয়া হল তার দেহের উপর। অবশেষে ঘুম ভাঙল তার।

জেগে উঠেই কুম্ভকর্ণ সেই রাশীকৃত মাংস আর কলসী কলসী রক্ত ও মদ খেল। তারপর সে চলল রাবণের সঙ্গে দেখা করতে।

লঙ্কার বিপদের কথা কুম্ভকর্ণকে জানাল রাবণ। সব শুনে কুম্ভকর্ণ হাস্য করে বলল: "রাজা, বলগর্বে অন্ধ হয়ে কোন ভাল কথাতেই ত কর্ণপাত করবে না তুমি, নইলে আমরা ত আগেই সৎ পরামর্শ দিয়েছিলাম তোমাকে। তুমি যদি বিভীষণের কথা শুনতে, তাহলে মঙ্গল হত আমাদের।"

বিভীষণের নাম শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হল, কিন্তু তিরস্কার করতে সাহস পেল না কুম্ভকর্ণকে, কেবল বলল: "তোমার গুরুজন আমি, তুমি কি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ? ভুলই যদি করে থাকি, তবে বারংবার আর সে কথা বলে লাভ কি? তুমি যদি সত্যই তোমার ভাইকে ভালবাস, তবে উপস্থিত বিপদ্ নিবারণ কর।"

রাবণকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল কুম্ভকর্ণ: "ঠিক আছে, রাজা। উদ্বিগ্ন হয়ো না তুমি। আমি তোমার শত্রুসংহার করব—দূর করব তোমার দুঃখের কারণ।"

এই বলে সাজসজ্জা করে হাতে এক ভয়ঙ্কর শূল নিয়ে যুদ্ধে চলল কুম্ভকর্ণ।

রণক্ষেত্রে পৌঁছে প্রচণ্ড সিংহনাদ করল কুম্ভকর্ণ। সে ত সিংহনাদ নয়—যেন বজ্রপাতের ধ্বনি! সে সিংহনাদে পর্বত কেঁপে উঠল, সমুদ্রতরঙ্গে জাগল প্রতিধ্বনি। বানরেরা তার বিপুল আকৃতি দেখে আর বিকট সিংহনাদ শুনে ভয়ে পালাতে লাগল।

অঙ্গদ অনেক বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনল বানরদের। তারা সবাই একত্র হয়ে আক্রমণ করল কুম্ভকর্ণকে। বড় বড় সব গাছ-পাথর এনে তাকে ছুড়ে মারতে লাগল তারা। কিন্তু সেগুলি তার লোহার মত শক্ত বুকের পাটায় ঠেকে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

বানরপ্রধানেরা একে একে পরাজিত হল কুম্ভকর্ণের হাতে। হনুমান মস্ত এক পাহাড় উপড়ে নিয়ে ছুড়ে মারল কুম্ভকর্ণকে। কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হল না তার। সে তখন শূলের আঘাতে হনুমানের বক্ষ বিদীর্ণ করল। হনুমান রক্ত-বমন করতে লাগল।

নীল শরভ গবাক্ষ অঙ্গদ প্রভৃতিও কুম্ভকর্ণের কাছে পরাজিত হল। তখন এলেন বানররাজ সুগ্রীব। কুম্ভকর্ণ শূল ছুড়ে তাঁকে বধ করার উপক্রম করল, কিন্তু হনুমান মধ্যপথেই সে শূল লুফে নিয়ে ভেঙে ফেলল। কুম্ভকর্ণ তখন মস্ত এক পর্বতচূড়া ছুড়ে মারল সুগ্রীবকে; সুগ্রীব মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কুম্ভকর্ণ তখন সুগ্রীবকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলল লঙ্কাপুরীতে।

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই চেতনা ফিরে এল সুগ্রীবের। তিনি তাঁর নখ ও দাঁত দিয়ে কুম্ভকর্ণের নাককান ছিঁড়ে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ফিরে এলেন রামের কাছে।

রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে ভীষণ এক মুদ্গর হাতে নিয়ে আবার

রণক্ষেত্রে এল কুম্ভকর্ণ। লক্ষ্মণ তাকে বাধা দেবার জন্য এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কুম্ভকর্ণ তাকে অগ্রাহ্য করে রামকে আক্রমণ করল।

সুতীক্ষ্ণ রুদ্রবাণে কুম্ভকর্ণের বক্ষ বিদ্ধ করলেন রাম। বাণাঘাতে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হল কুম্ভকর্ণ—হাত থেকে তার গদা খসে পড়ে গেল। সে বাছবিচার না করে বানর ও ভল্লুক ধরে ধরে গোগ্রাসে খেতে লাগল। রাম তখন অসংখ্য বাণ ছুড়ে মারলেন তাকে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না তার। এমন কি, যে বাণে রাম সপ্তশাল ভেদ করেছিলেন এবং যে বাণে বধ করেছিলেন বালীকে, সে সব বাণেও বিচলিত হল না সেই দুরন্ত রাক্ষস।

রাম এবার বায়ব্য অস্ত্র দিয়ে কুম্ভকর্ণের গদা ও ডানহাতখানি কেটে ফেললেন। কুম্ভকর্ণ তখন তার বাঁ-হাত দিয়ে মস্ত এক তালগাছ উপড়ে নিয়ে আক্রমণ করল রামকে। রাম ঐন্দ্রাস্ত্র দিয়ে তার বাঁ-হাতখানিও কেটে ফেললেন, তারপর ঐন্দ্রাস্ত্র দিয়েই ছিন্ন করলেন তার পা-দুটি।

তবু কি হার মানে কুম্ভকর্ণ—মহাবেগে রাহুর মত গড়িয়ে গড়িয়ে সে গিলতে গেল রামকে। রাম তখন দুর্বার ঐন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করলেন কুম্ভকর্ণের প্রতি। সেই বাণে মস্তক ছিন্ন হল তার, আর পর্বতপ্রমাণ দেহটি গিয়ে পড়ল সমুদ্রে; সেই বিশাল দেহের চাপে অসংখ্য জলচর প্রাণী বিনষ্ট হল।

হনুমান কর্তৃক ওষধি আনয়ন

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুসংবাদে মুহ্যমান হয়ে পড়ল রাবণ। বিভীষণের সৎ পরামর্শ অগ্রাহ্য করেছিল বলে আজ ভারী অনুতাপ হল তার। শোকে আত্মহারা হয়ে বিলাপ করতে লাগল সে।

রাবণপুত্র ত্রিশিরা পিতাকে প্রবোধ দিয়ে যুদ্ধযাত্রা করল। ত্রিশিরার ভ্রাতা দেবান্তক নরান্তক এবং অতিকায়ও তার সঙ্গে চলল, আর চলল রাবণের বৈমাত্র ভ্রাতা মহোদর ও মহাবীর।

কিন্তু প্রাণপণ যুদ্ধ করেও প্রাণ হারাল রাক্ষস-বীরেরা। অঙ্গদ বধ করল নরান্তককে। দেবান্তকের মাথা চূর্ণ করে দিল হনুমান, চোখ উলটে জিভ বার করে প্রাণ হারাল সে। নীল পাহাড় ছুড়ে মেরে সংহার করল মহোদরকে। তা দেখে মহাবীর ত্রিশিরা বিষম ক্রোধে হনুমানকে খড়্গাঘাত করল। হনুমান সেই খড়্গ ছিনিয়ে নিয়ে তা দিয়েই ত্রিশিরার তিনটি শির কেটে ফেলল। গদা নিয়ে যুদ্ধ করছিল মহাপার্শ্ব। ঋষভ সেই গদা কেড়ে নিয়ে তা দিয়েই বক্ষ চূর্ণ করে দিল মহাপার্শ্বের। প্রাণ হারিয়ে ভূলুণ্ঠিত হল মহাপার্শ্ব।

তখন পর্বতের ন্যায় বিশালদেহ মহাবীর অতিকায় হাজার ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে যুদ্ধে এল। তার বাণে বড় বড় সব বানর-বীর আহত হয়ে পরাজিত হল। তখন লক্ষ্মণ অতিকায়ের সম্মুখীন হলেন। সেই দুই মহাবীরের বিস্ময়কর যুদ্ধ দেখার জন্য দেবতারা পর্যন্ত রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। অনেকক্ষণ ধরে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করলেন দুজনে। অবশেষে লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র ছুড়ে শিরশ্ছেদ করলেন অতিকায়ের।

পঞ্চ মহাবীরের নিধন-সংবাদে রাবণ যেমনি হল শোকার্ত তেমনি উদ্বিগ্ন। তখন বীরচূড়ামণি ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধযাত্রা করল।

যুদ্ধে এসেই অদৃশ্য হয়ে মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করল ইন্দ্রজিৎ। শীঘ্রই সে শরজালে বিঁধে বিঁধে অভিভূত করে ফেলল রাম-লক্ষ্মণ সমেত সমগ্র বাহিনীকে। রাম-লক্ষ্মণ মৃতপ্রায় হয়ে ভূতলে পড়ে রইলেন। বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ সহর্ষে ফিরে গেল লঙ্কায়।

সেদিনের যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের শরাঘাত সহ্য করে সুস্থ ছিল কেবল হনুমান ও বিভীষণ। সেই দারুণ রজনীতে মশাল জ্বেলে রণভূমিতে বিচরণ করতে লাগল দুজনে। ঘুরতে ঘুরতে তারা গিয়ে উপস্থিত হল জাম্ববানের কাছে।

বিভীষণকে দেখে মুমূর্ষু জাম্ববান ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল: "হনুমান জীবিত আছে ত? সে জীবিত থাকলে আমাদের বাহিনী মৃত হলেও জীবিত। কিন্তু যে যদি বেঁচে না থাকে, তবে আমরা জীবিত হলেও মৃত।"

হনুমান তখন এগিয়ে এসে প্রণাম করল জাম্ববানকে। তাকে দেখে যেন মৃতদেহে প্রাণ পেল জাম্ববান, বলল: "এস বীর, এস বানরশ্রেষ্ঠ, তোমার পরাক্রম দেখাবার সময় উপস্থিত হয়েছে। তুমি সাগর পেরিয়ে সুদূর হিমালয়ে যাও। ঋষভ ও কৈলাস হল হিমালয়ের দুটি শৃঙ্গ। ঐ শৃঙ্গ দুটির মাঝখানে আছে ওষধি নামে আরেকটি শৃঙ্গ। ওষধি-শৃঙ্গের শীর্ষদেশে মৃতসঞ্জীবনী বিশল্যকরণী সাবর্ণ্যকরণী ও সন্ধানী নামে চার প্রকার মহৌষধি আছে। যাও বীর, তুমি ঐ সকল ঔষধি এনে প্রাণদান কর আমাদের।"

এ কথা শোনা মাত্র হনুমান তার শরীর স্ফীত করে লম্ফ দিল। মহাবেগে আকাশ-পথে সমুদ্র পেরিয়ে সে গিয়ে উপস্থিত হল হিমালয়-পর্বতে। কিন্তু ওষধি-শৃঙ্গে উঠে মহৌষধিগুলি খুঁজে পেল না সে, কারণ তাকে দেখেই সেগুলি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

এতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হল হনুমান। গোটা ওষধি-শৃঙ্গটিই সে উপড়ে নিয়ে ফিরে এল লঙ্কায়। ওষধির ঘ্রাণে রাম-লক্ষ্মণ এবং সমস্ত বানর-বাহিনী সুস্থ হল—মৃতপ্রায় দেহে নতুন প্রাণ পেল তারা। শুধু তাই-ই নয়, এতদিনের যুদ্ধে যে সব বানর ও ভল্লুক প্রাণ হারিয়েছিল,

তারাও বেঁচে উঠল,—মনে হল যেন সদ্য ঘুম ভেঙে জাগল তারা। মৃত রাক্ষসেরা কিন্তু বাঁচল না, কারণ তারা নিহত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের দেহগুলি ফেলে দেওয়া হয়েছিল সমুদ্রে।

হনুমান তখন ওষধি-শৃঙ্গটি যথাস্থানে রেখে দিয়ে এল।

ইন্দ্রজিৎ-বধ

অদ্ভুতকর্মা হনুমানের সাহায্যে পুনর্জীবন লাভ করে দ্বিগুণ উৎসাহে গর্জে উঠল বানর ও ভল্লুকেরা। তখন সুগ্রীবের আদেশে সকলে মিলে আক্রমণ করল লঙ্কাপুরী।

বানরেরা মশাল জ্বেলে আগুন লাগাতে লাগল লঙ্কার প্রতিটি তোরণে ভবনে। রাক্ষসেরা প্রাণভয়ে স্ত্রীপুত্র নিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা—হয় আগুনে নয়ত বানরদের হাতে প্রাণ দিতে লাগল তারা। লঙ্কার ঘরে ঘরে জেগে উঠল মর্মান্তিক হাহাকার।

তখন রাবণের আদেশে যুদ্ধে এল কুম্ভকর্ণের দুই পুত্র—কুম্ভ ও নিকুম্ভ। তাদের সঙ্গে এল মহাবীর যূপাক্ষ শোণিতাক্ষ প্রজঙ্ঘ ও কম্পন বিপুল রাক্ষস-বাহিনী নিয়ে। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই অঙ্গদ বধ করল কম্পন ও প্রজঙ্ঘকে, শোণিতাক্ষকে সংহার করল দ্বিবিধ, যূপাক্ষ প্রাণ হারাল মৈন্দের হাতে।

তা দেখে বীর কুম্ভ মহাবিক্রমে আক্রমণ করল বানরদের। তার বাণে অঙ্গদ ধরাশায়ী হল। তখন সুগ্রীব এসে আক্রমণ করলেন কুম্ভকে। কুম্ভ দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সুগ্রীবকে, সুগ্রীব তাকে সবলে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। জল থেকে উঠে এসে কুম্ভ সুগ্রীবকে ভূপাতিত করে তাঁর বক্ষে বজ্রসম মুষ্ট্যাঘাত করল। সুগ্রীব রক্তাক্ত

দেহে কোনমতে উঠে কুম্ভের বক্ষে বজ্রসম মুষ্টিপ্রহার করলেন। তাতেই প্রাণ হারাল সে।

ভ্রাতা কুম্ভের মৃত্যু দেখে নিকুম্ভ অগ্রসর হল। কিন্তু তুমুল যুদ্ধের পর হনুমান তাকে বধ করল।

এবার যুদ্ধে এল খরের পুত্র মকরাক্ষ। অল্পকালমধ্যেই রাম বধ করলেন তাকে।

আর বড় বীর নেই লঙ্কায় ইন্দ্রজিৎ ও রাবণ ছাড়া। ইন্দ্রজিৎকেই এবার যুদ্ধে পাঠাল রাবণ।

রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করল ইন্দ্রজিৎ। আকাশে অদৃশ্য থেকে শরবর্ষণ করতে লাগল সে। সেই শরাঘাতে বহু বানর ও ভল্লুক হতাহত হল,—এমন কি, রাম-লক্ষ্মণ পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হলেন।

তখন লঙ্কায় ফিরে গেল ইন্দ্রজিৎ। কিছুক্ষণ পরেই সে সীতার একটি মায়ামূর্তি নিয়ে আবার রণক্ষেত্রে এল। বানরদের সামনে সেই মায়াসীতাকে খড়্গাঘাত করতে লাগল সে, আর মায়ামূর্তিটি "হা রাম" বলে রোদন করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রজিৎ বধ করল মায়াসীতাকে।

তা দেখে হনুমান সরোষে প্রকাণ্ড এক শিলা নিক্ষেপ করল ইন্দ্রজিতের রথের উপর, অন্যান্য বানরেরাও ছুটে এসে আক্রমণ করল তাকে। ইন্দ্রজিৎও বহু বানর বধ করতে লাগল।

তখন শোকার্ত হনুমান বানরদের বলল: "যে সীতার জন্য এত কাণ্ড, তিনিই যখন প্রাণ হারালেন তখন কি আর হবে যুদ্ধ করে? চল, আমরা গিয়ে রামকে সংবাদ জানাই।"

হনুমানের মুখে সব শুনে শোকে অধীর হলেন রাম। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বিলাপ করতে লাগলেন তিনি। লক্ষ্মণ তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন প্রবোধই তিনি মানলেন না।

এমন সময়ে বিভীষণ এল সেখানে। লক্ষ্মণের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে সে বলল: "ইন্দ্রজিৎ কখনই বধ করতে পারে না সীতাকে। রাবণ কখনই সীতাকে বধ করতে দেবে না। ইন্দ্রজিৎ যাকে বধ করেছে, তা হল সীতার মায়ামূর্তি। মায়াসীতাকে বধ করায় শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন আপনারা, আর এই অবসরে সে গেছে নিকুম্ভিলাদেবীর যজ্ঞাগারে হোম করতে। এই যজ্ঞ সমাপ্ত করতে পারলে, সে হবে অজেয়; ফলে, তার হাতে আমরা মারা পড়ব সবাই।"

এই বলে রামকে সম্বোধন করে বিভীষণ বলল: "দাশরথি, আপনি মিথ্যা শোক ত্যাগ করুন। ব্রহ্মা বলেছিলেন ইন্দ্রজিৎকে যে, নিকুম্ভিলায় যজ্ঞানুষ্ঠানের আগে যে শত্রু তাকে আক্রমণ করবে, সেই শত্রুর হাতেই তার মৃত্যু। আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলার মন্দিরে যাব। লক্ষ্মণ শরবর্ষণ দ্বারা পণ্ড করবেন ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ।"

নিকুম্ভিলায় যজ্ঞের আয়োজন করছে ইন্দ্রজিৎ। এমন সময়ে বিভীষণ ও লক্ষ্মণ সসৈন্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে। আরম্ভ হল উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞাগার থেকে বেরিয়ে এসে কঠিন বাণবর্ষণে জীবনসংশয় করে তুলল হনুমানের। তা দেখে লক্ষ্মণ এগিয়ে এসে আক্রমণ করলেন ইন্দ্রজিৎকে।

বিভীষণকে কঠিন তিরস্কার করে বলল ইন্দ্রজিৎ: "হে পিতৃব্য, ধিক্ আপনাকে! স্বজন ত্যাগ করে ঘরের সন্ধান দিচ্ছেন শত্রুকে!"

ষণ উত্তর দিল: "ইন্দ্রজিৎ, রাক্ষসকুলে জন্মেও আমি

ধর্মপরায়ণ। তোমার পিতার চরম অধার্মিকতা ক্ষুব্ধ করেছে আমাকে। তাই তাঁকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি আমি।"

তখন ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল ইন্দ্রজিতে ও লক্ষ্মণে। তুই বীরশ্রেষ্ঠের নিক্ষিপ্ত শরসমূহ জমে স্তূপাকার হয়ে উঠল। তাঁদের বাণে আকাশ ছেয়ে গেল, ঢাকা পড়ল দিনের আলো। লক্ষ্মণ শরাঘাতে ইন্দ্রজিতের সারথির শিরশ্ছেদ করলেন। ইন্দ্রজিৎ তখন নিজেই রথচালনা করে যুদ্ধ করতে লাগল। কিন্তু বানরেরা তার রথের ঘোড়াগুলিকেও বিনষ্ট করল। ইন্দ্রজিৎ তখন অদৃশ্য হয়ে লঙ্কায় গেল এবং ক্ষণকাল পরেই অন্য রথে চড়ে যুদ্ধে এল। লক্ষ্মণ তখন তুর্বার ঐন্দ্র বাণে মাথা কেটে ফেললেন ইন্দ্রজিতের।

বানরেরা মহানন্দে সিংহনাদ করে উঠল, আর রাক্ষস-বাহিনীতে পড়ে গেল হাহাকার।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

ইন্দ্রজিতের নিধন-সংবাদ পৌঁছল রাবণের কাছে। এবার আর তুঃখের অবধি রইল না দশাননের। শোকে উন্মত্তপ্রায় হয়ে বিলাপ করতে লাগল সে। তাকে সান্ত্বনা দিতে সাহস পেল না কেউ।

বিলাপ করতে করতে তুর্জয় ক্রোধ জেগে উঠল রাবণের অন্তরে। সে ক্রোধ সীতার উপরে। "সীতাই যত অনর্থের মূল। পুত্র ইন্দ্রজিৎ বানরদের ফাঁকি দেবার জন্য মায়াসীতাকে বধ করেছিলেন, আজ আমি প্রকৃত সীতাকেই বধ করব" এই বলে রাবণ মহারোষে মহাবেগে গেলেন সীতার কাছে অশোকবনে।

রাবণের ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে সীতা ত ভয়েই অস্থির। রাবণ সীতাকে বধ করতে উদ্যত হলেন। এমন সময়ে মন্ত্রী সুপার্শ্ব বাধা দিয়ে

বললেনঃ "রাজন্, বড় বংশে জন্মেও কেন স্ত্রীহত্যার মত হীন কার্য করতে যাচ্ছেন আপনি? কাল অমাবস্যা। আপনি যুদ্ধ করে বধ করুন রামকে। সেই হবে আপনার যোগ্য কাজ।"

সৎস্বভাব সুপার্শ্বের পরামর্শে সীতাহত্যা থেকে নিবৃত্ত হল দশানন। প্রাসাদে ফিরে চলল সে। পথে সে বিলাপ শুনতে পেল সেই সব রাক্ষসীদের, যাদের স্বামী বা পুত্র বা ভ্রাতা যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। অভাগিনী রাক্ষসীরা বিলাপ করে করে দোষ দিচ্ছে শূর্পণখা ও রাবণকে। সে বিলাপ শুনে ক্ষোভে ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠল দশানন—বিশ চক্ষু তার রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তার দশ অধর দংশন করতে লাগল সে।

লঙ্কায় এখনও অসংখ্য সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। তাদের সাজিয়ে নিয়ে রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল লঙ্কেশ্বর। সঙ্গে চলল অবশিষ্ট তিন সেনাপতি—বিরূপাক্ষ মহোদর ও মহাপার্শ্ব।

আরম্ভ হল প্রচণ্ড সংগ্রাম। সুগ্রীবের হাতে প্রাণ হারাল বিরূপাক্ষ ও মহোদর, আর মহাপার্শ্বকে বধ করল অঙ্গদ।

এ দেখে রাবণ বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে মহাতেজে যুদ্ধ আরম্ভ করল। লক্ষ্মণ তাকে বাধা দিতে এলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে রাবণ এক অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ করল। সেই শক্তি এসে বিঁধল লক্ষ্মণের বুকে। মৃতের মত হতচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। বানরেরা তাঁর বুক থেকে সেই শক্তি তুলে ফেলার জন্য বহু চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। রাম তখন নিজে সেই শক্তি টেনে তুলে ভেঙে ফেললেন, তারপর যুদ্ধ করতে লাগলেন রাবণের সঙ্গে।

শক্তিশেলে বিদ্ধ হয়ে জীবনসংশয় হয়েছে লক্ষ্মণের। সেই দুঃখে রাম আজ দুর্মদ। তাঁর সামনে দাঁড়াতেই পারল না রাবণ। বৃষ্টি-

ধারার মত শরবর্ষণ করতে লাগলেন রাম। সেই শরবর্ষণে নিপীড়িত হয়ে রাবণ শীঘ্রই রণস্থল পরিত্যাগ করল।

শক্তিশেলে বিদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন লক্ষ্মণ। চোখে তাঁর নেমে এসেছে মরণের কাল ছায়া।

রাবণকে রণক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করে প্রাণপ্রিয় ভাইয়ের কাছে ফিরে এলেন রাম। লক্ষ্মণের অবস্থা দেখে বিলাপ করে বলতে লাগলেন তিনি: "প্রাণাধিক ভাই লক্ষ্মণ আজ ধুলোয় লোটাচ্ছেন। কি জন্য আর যুদ্ধ করব? বেঁচে থেকেই বা আমার লাভ কি? দেশে দেশে পত্নী পাওয়া যায়, বন্ধুও মেলে, কিন্তু লক্ষ্মণের মত ভাই দুর্লভ। কি বলে আমি প্রবোধ দেব সুমিত্রা-জননীকে? আমিও লক্ষ্মণের সঙ্গে জীবনত্যাগ করব।"

রামকে আশ্বাস দিয়ে বানরপ্রধান সুষেণ বলল: "লক্ষ্মণ মরেননি। এখনও এঁর হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে। আপনি শান্ত হন।" এই বলে সুষেণ হনুমানকে অনুরোধ করল আবার ওষধি-পর্বত থেকে মহৌষধিগুলি নিয়ে আসতে।

তৎক্ষণাৎ যাত্রা করল হনুমান। মহাবেগে আকাশ-পথে ওষধি-পর্বতে উপস্থিত হল সে, কিন্তু এবারও মহৌষধিগুলি খুঁজে পেল না। তখন সে পুনরায় ওষধি-শৃঙ্গটি উপড়ে নিয়ে এল লঙ্কায়। সুষেণ ঔষধি বেছে নিয়ে চূর্ণ করে খাইয়ে দিল লক্ষ্মণকে। লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করলেন।

রাবণ-বধ

আবার রণক্ষেত্রে এল রাবণ।

রাবণ রথে চড়ে যুদ্ধ করছে, আর রাম করছেন ভূতলে দাঁড়িয়ে। তা দেখে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর নিজের রথ ও সারথিকে পাঠিয়ে দিলেন রামের জন্য। সেই রথে চড়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন রাম।

রাবণ আজ ভয়ঙ্কর। তার বাণে সমস্ত বানর ভল্লুক ও বিভীষণ নিপীড়িত হল, সমুদ্র হল চঞ্চল, সূর্যের আলো পড়ল ঢাকা।

তা দেখে রামও ভীষণ হয়ে উঠলেন। বর্ষার ধারার মত শরবর্ষণ করতে লাগলেন তিনি। তাঁর বাণে শীঘ্রই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল রাবণ। তা দেখে রাম আর বধ করলেন না তাকে। রাবণের সারথি ভীত হয়ে রণক্ষেত্র থেকে রথ সরিয়ে নিয়ে গেল।

শীঘ্রই চেতনা ফিরে পেল রাবণ। রণক্ষেত্র থেকে রথ সরিয়ে আনার জন্য সারথিকে ভর্ৎসনা করল সে। তারপর সে অবিলম্বে আবার যুদ্ধ করতে এল রামের সঙ্গে।

ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হতে লাগল রামে আর রাবণে। রাম সুতীক্ষ্ণ বাণে দশাননের দশ মুণ্ড কেটে ফেললেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, রাম যত বারই তার মাথাগুলি কাটেন, তত বারই পলক না ফেলতে নতুন মাথা গজায়!

প্রবলভাবে শরনিক্ষেপ করতে লাগলেন রাম, কিন্তু তাঁর সমস্ত বাণই রাবণের দেহে ঠেকে ব্যর্থ হল। অবশেষে তিনি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্র হাতে নিলেন। অমোঘ এ অস্ত্র। দশ দিক্ কাঁপিয়ে সেই বাণ ছুটে গেল রামের ধনুঃ থেকে। মুহূর্তমধ্যে সে বাণ রাবণের বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে গিয়ে প্রবেশ করল মাটিতে, পরক্ষণেই আবার ফিরে এল রামের তূণীরে!

প্রাণ হারিয়ে বিশাল পর্বতশৃঙ্গের মত ভূতলে লুটিয়ে পড়ল দশানন। কোথায় রইল আজ তার শক্তি আর দর্প? অধর্মের চূড়ান্ত পরাজয় হল আজ—ধর্ম হল জয়ী!

ভ্রাতাকে মৃত দেখে সকাতরে বিলাপ করতে লাগল বিভীষণ। রাম তাকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলেন।

রাবণ নিহত হয়েছে শুনে তার পত্নীরা আলুথালু বেশে রণক্ষেত্রে ধেয়ে এসে বিলাপ করতে লাগল। তাদের করুণ বিলাপ শুনে পশু কাঁদল, পাখি কাঁদল, কাঁদল আকাশ-বাতাস-মাটি! রামের আদেশে বিভীষণ অনেক প্রবোধ দিয়ে শান্ত করল তাদের।

তখন রাম বললেন: "বিভীষণ, তুমি লঙ্কেশ্বর দশাননের মৃতদেহের সসম্মান সৎকারের ব্যবস্থা কর।"

রাবণের সমস্ত পুত্রকলত্র ও আত্মীয়-স্বজন রামের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সুতরাং, বিভীষণই এখন তার মুখাগ্নির অধিকারী। কিন্তু দুষ্কৃতি রাবণের মুখাগ্নি করতে সম্মত হল না বিভীষণ। শেষে রাম অনেক করে তাকে বোঝাতে জ্যেষ্ঠের সৎকার করল সে। চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল দম্ভী দশাননের দেহ।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা

রামের আদেশে লঙ্কার শূন্য সিংহাসনে বিভীষণকে বসান হল। বিভীষণের অভিষেকের পর সীতাকে সংবাদ জানাবার জন্য রাম হনুমানকে পাঠালেন অশোকবনে।

সব শুনে সীতা উল্লসিতা হলেন। হনুমান তখন তাঁকে বললেন:

"দেবী, রাবণের এই সকল চেড়ীরা দারুণ নির্যাতন করেছে তোমাকে। অনুমতি দাও, এদের বধ করি আমি।"

হনুমানের কথা শুনে ত ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল চেড়ীদের। কিন্তু করুণাময়ী সীতা সদয়কণ্ঠে বললেন হনুমানকে: "না, বৎস, কোন অত্যাচার করো না এদের উপর। রাবণের দাসী এরা—প্রভুর আদেশেই এরা নির্যাতন করেছে আমাকে। প্রকৃতপক্ষে কোন দোষ নেই এদের।"

সীতার ক্ষমাগুণ দেখে মুগ্ধ হল হনুমান।

অশোকবন থেকে ফিরে হনুমান রামকে জানাল যে, সীতাদেবী কুশলেই আছেন, তবে ভারী ব্যাকুল হয়েছেন রামকে দেখার জন্য।

এ কথা শুনে রাম বিভীষণকে আদেশ দিলেন: সীতার মাথা ধুইয়ে তাঁকে দিব্য অঙ্গরাগে ও আভরণে ভূষিত করে শীঘ্র নিয়ে আসতে।

বিভীষণ তৎক্ষণাৎ সীতার কাছে গেল। সীতা প্রথমে স্নানও করতে চাইলেন না, অঙ্গরাগে বা আভরণে ভূষিত হতেও চাইলেন না, বললেন: যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থাতেই তিনি দেখা করবেন স্বামীর সঙ্গে। শেষে বিভীষণ যখন বলল যে, রামই ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তখন পতিব্রতা সীতা স্বামীর আদেশ পালন করলেন।

সীতাকে এনে বিভীষণ সভার সমস্ত লোককে সরিয়ে দেবার আদেশ দিল। কিন্তু রাম তাকে নিবৃত্ত করলেন, বললেন: "ওরা থাকবে—ওরা আমার স্বজন।"

রামের সামনে এলেন সীতা। কিন্তু কি আশ্চর্য, রাম তাঁকে

বললেন ঃ “জানকী, দৈবচক্রে রাক্ষস হরণ করেছিল তোমাকে, আমি আমার পৌরুষবলে উদ্ধার করেছি। কিন্তু জেনো, এই যুদ্ধ তোমার উদ্ধারের জন্য করিনি—করেছি আমার বংশের সুনাম রক্ষার জন্য। রাবণ তোমাকে স্পর্শ করেছে, এখন তোমাকে গ্রহণ করলে আমার বংশের সুনাম নষ্ট হবে। সুতরাং, এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।”

রামের কথা শুনে লজ্জায় ঘৃণায় বিহ্বল হয়ে পড়লেন সীতা। অভাগিনীর দু চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এল। তিনি তা মুছে গদ্‌গদস্বরে বললেন ঃ “ইতর লোকের মত ব্যবহার করলে তুমি। হনুমানকে যখন পাঠিয়েছিলে, তখন কেন জানাওনি এ কথা? তাহলে তখনই জীবন বিসর্জন দিতাম আমি। রাবণ যে আমাকে স্পর্শ করেছিল, সে কি আমার ইচ্ছায়? ঠিক আছে, তুমি যখন আমার পতিভক্তিকে অবজ্ঞা করলে, তখন মৃত্যুই শ্রেয়ঃ আমার।”

এই বলে তিনি লক্ষ্মণকে অনুরোধ করলেন ঃ “দেবর, চিতা সাজাও, অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণবিসর্জন দেব আমি।”

লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধনেত্রে রামের দিকে তাকালেন, তারপর নীরবে বিষণ্ণ চিত্তে চিতা সাজিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। সীতা তখন অধোমুখে যুক্তকরে রামকে প্রদক্ষিণ করে সর্ব দেবতা ও ব্রাহ্মণদের প্রণাম জানিয়ে বললেন ঃ “আমি যদি প্রকৃতই পতিব্রতা সতী হই, তবে অগ্নিদেব যেন রক্ষা করেন আমাকে।” এই বলে তিনি নির্ভয়ে অগ্নিপ্রবেশ করলেন।

উপস্থিত সকলে হাহাকার করতে লাগল—এমন কি, পতিপুত্র-হীনা রাক্ষসীরা পর্যন্ত।

তখন সর্ব দেবতা আবির্ভূত হলেন সেখানে। আর আবির্ভূত হলেন স্বয়ং অগ্নিদেব—সীতাকে কোলে নিয়ে জ্বলন্ত চিতা থেকে

এলেন তিনি! সবাই বিস্মিত হয়ে দেখল: আগুনে এতটুকু ক্ষতি হয়নি সীতার, বরং আরও যেন রূপ বেড়েছে তাঁর—আরও যেন জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠেছেন তিনি!

রামের সামনে সীতাকে রেখে অগ্নিদেব বললেন: "রাম, এই সীতা-সতীর মত পতিব্রতা নারী ত্রিভুবনে বিরল। কিছুমাত্র দোষ নেই তাঁর চরিত্রে।"

রাম তখন সহর্ষে গ্রহণ করলেন সীতাকে।

অনেক বানর ও ভল্লুক রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল। এদের বাঁচিয়ে দেবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুরোধ করলেন রাম। ইন্দ্রের বরে পুনর্জীবন লাভ করল সমস্ত নিহত বানর ও ভল্লুক—সদ্য ঘুম ভেঙে যেন জেগে উঠল তারা!

রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যভার-গ্রহণ

শেষ হল বনবাসের চতুর্দশ বৎসর। কত দুঃখে-সুখে, কত ঘটনা-দুর্ঘটনায় ভরা চোদ্দটি বছর! এবার অযোধ্যায় ফেরার পালা।

রাবণের পুষ্পক-রথখানি এনে দিল বিভীষণ, বলল: "রাম, এই রথে চড়ে একদিনেই আপনি পৌঁছতে পারবেন অযোধ্যায়।"

সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে রথে উঠলেন রাম। কিন্তু বানর ও ভল্লুকেরা রামের সঙ্গ ছাড়তে চাইল না—তারাও অযোধ্যায় যাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল। রাম তাদের নিয়ে যেতে সম্মত হলেন। তখন তারাও পুষ্পক-রথে উঠে বসল, বিভীষণ এবং সুগ্রীবও উঠলেন। কি আশ্চর্য, সেই কোটি কোটি আরোহী নিয়ে আকাশ-পথে মহাবেগে উড়ে চলল পুষ্পক-রথ।

সীতাকে বিভিন্ন স্থানগুলি দেখাতে দেখাতে চললেন রামঃ ঐ ত্রিকূট পাহাড়, ঐ রণভূমি, ঐ নলের নির্মিত সেতু, ঐ মহাসমুদ্র, ঐ মৈনাক-পর্বত, ঐ সেতুবন্ধ, ঐ কিষ্কিন্ধ্যা।

কিষ্কিন্ধ্যায় রথ নামাবার জন্য রামকে অনুরোধ করলেন সীতা। রথ নামতে বানরবধূগণ সীতাকে দেখতে এল। সীতা তাদের সাদরে রথে তুলে নিলেন।

আবার ছুটে চলল রথ। দেখতে দেখতে ঋষ্যমূক-পর্বত, পম্পা-সরোবর, জনস্থান, লক্ষ্মণের তৈরী কুটির, গোদাবরী-নদী, অগস্ত্যমুনির আশ্রম, শরভঙ্গমুনির আশ্রম, অত্রিমুনির আশ্রম, চিত্রকূট পাহাড়, যমুনা-নদী পেরিয়ে রথ এসে পৌঁছল ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে।

ভরদ্বাজের আশ্রমে রাম রথ নামালেন। মুনির অনুরোধে তিনি সদলে আতিথ্য গ্রহণ করলেন সেখানে।

তারপর রাম হনুমানকে আদেশ দিলেন শৃঙ্গবেরপুরে গিয়ে নিষাদরাজ গুহকে সকল সংবাদ জানাতে, তারপর ভরতের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মনোভাব জানতে।

মানুষের মূর্তি ধারণ করে যাত্রা করল হনুমান। চণ্ডালরাজ গুহকে সংবাদ দিয়ে সে দ্রুতগতিতে গেল ভরতের কাছে

সিংহাসনে রামের পাদুকা স্থাপন করে রাজ্যশাসন করছেন ভরত। পরনে তাঁর তপস্বীর বেশ, ফলমূল তাঁর একমাত্র আহার। রামের পথ চেয়ে চেয়ে নিদারুণ মনঃকষ্টে দিন কাটাচ্ছেন তিনি।

হনুমানের মুখে বার্তা শুনে পরমানন্দিত হলেন ভরত। রামের সংবর্ধনার জন্য উপযুক্ত আয়োজন করতে আদেশ দিলেন শত্রুঘ্নকে।

পরদিন রামকে অভ্যর্থনা করে আনতে চললেন ভরত। তাঁর সঙ্গে চললেন মন্ত্রীরা, চললেন দশরথের রানীরা আর যত পুরজন,

চলল হাজার হাজার সৈন্য যানবাহনে চড়ে ধ্বজপতাকা নিয়ে। পুরোহিত ও প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে ভরত চললেন সর্বাগ্রে; তাঁর মাথায় রামের পাদুকা, হাতে রাজচ্ছত্র ও চামর। বন্দীরা স্তুতিগান গাইতে লাগল, বাজাতে লাগল শঙ্খ আর ভেরী। বহুদিন পরে আবার আনন্দের জোয়ার এল কোশলে।

রাম এলেন অযোধ্যায়। মহাসমারোহে অভিষেক হল তাঁর। সিংহাসনে বসে রাম বহু ধন দান করলেন ব্রাহ্মণদের; সুগ্রীব অঙ্গদ বিভীষণ এবং অন্যান্য বানর ও ভল্লুকদের বহু উপহার দিলেন তিনি। আর সীতা তাঁর নিজের কণ্ঠহার দিলেন অদ্ভুতকর্মা বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে।

ভরতকে করা হল রাজ্যের যুবরাজ।

রামের শাসনগুণে সর্বসুখে সুখী হল প্রজাপুঞ্জ।

উত্তরকাণ্ড

রাবণাদির পূর্ববৃত্তান্ত

রাম সিংহাসনে বসলে অগস্ত্যপ্রমুখ মহামুনিরা একদিন এলেন তাঁর কাছে। রাক্ষসবধের জন্য রামকে অভিনন্দিত করলেন তাঁরা। রামের অনুরোধে মহামুনি অগস্ত্য রাবণাদির পূর্ববৃত্তান্ত বললেন।

মহামুনি বিশ্রবা ছিলেন দেবাদিদেব ব্রহ্মার পৌত্র। ভরদ্বাজমুনির কন্যা দেববর্ণিনীকে তিনি বিবাহ করেন। ধনদেবতা কুবের তাঁদেরই পুত্র। ব্রহ্মার আদেশে কুবের লঙ্কায় রাজ্যস্থাপন করেন।

লঙ্কাপুরী নির্মাণ করেছিলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। আগে এখানে রাজত্ব করত মাল্যবান্ সুমালী ও মালী নামে তিন রাক্ষস-ভ্রাতা। কঠোর তপস্যা করে তারা ব্রহ্মার কাছে বর পেয়ে মহাশক্তিধর ও অজেয় হয়ে ওঠে। তখন তারা দেবতাদের উপর অত্যাচার করতে আরম্ভ করে। এতে ভগবান্ বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের লঙ্কা থেকে বিতাড়িত করেন। তখন তারা পাতালে আশ্রয় নেয়।

কুবের লঙ্কার রাজা হলে সুমালীর অত্যন্ত ঈর্ষ্যা জাগে। তার কৈকসী নামে একটি পরম রূপবতী কন্যা ছিল। সুমালী কৌশল করে ঐ কন্যার সঙ্গে কুবেরের পিতা বিশ্রবার বিয়ে দেয়। ফলে, কৈকসীর তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মায়। জ্যেষ্ঠ রাবণ—তার দশ মুণ্ড, কুড়ি হাত, বড় বড় দাঁত, মেঘের মত গায়ের রঙ্; তারপর জন্মাল মহাবল কুম্ভকর্ণ; তারপর কন্যাটি—বিকৃতাননা শূর্পণখা; সর্বশেষে বিভীষণ।

রাবণ কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ—এই তিন ভাই মিলে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করল। তাদের তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে বর দিতে এলেন ব্রহ্মা।

রাবণ বর চাইল : "পক্ষী নাগ যক্ষ দৈত্য দানব রাক্ষস দেবতা—এরা কেউ যেন না বধ করতে পারে আমাকে। অন্য প্রাণীদের জন্য চিন্তা নেই আমার, আর মানুষকে ত আমি তৃণজ্ঞান করি।"

ব্রহ্মা বললেন : "তথাস্তু"—তাই হোক !

হায়, রাবণ কি তখন জানত যে, তুচ্ছ মানুষই বধ করবে তাকে ?

বিভীষণ বললেন : "ভগবন্, মহাবিপদের মধ্যেও যেন আমার ধর্মে মতি থাকে, আমার যেন ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়।" ব্রহ্মা বললেন : "তাই হবে, বৎস। রাক্ষসবংশে জন্মেও তুমি ধর্মিষ্ঠ, সেজন্য অমর হবে তুমি।"

এবার কুম্ভকর্ণকে বরদানের পালা। দেবগণ কৃতাঞ্জলি হয়ে ব্রহ্মাকে মিনতি করলেন : "কুম্ভকর্ণকে বর দেবেন না, প্রভু। ঐ দুর্মতি এরই মধ্যে সাতটি অপ্সরা, ইন্দ্রের দশ অনুচর এবং অনেক ঋষি ও মানুষকে ভক্ষণ করেছে। বর পেলে ত্রিভুবন গ্রাস করবে ও।"

তখন ব্রহ্মার আদেশে দেবী সরস্বতী প্রভাবিত করলেন কুম্ভকর্ণকে। সেই প্রভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে সে বর চাইল : "আমি যেন অনেক বৎসর ঘুমতে পারি এমনি বর দিন আমাকে।"

"তথাস্তু"—তাই হোক, বললেন ব্রহ্মা। দেবতারা আনন্দিত হলেন।

ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হয়ে রাবণ তার বৈমাত্র ভ্রাতা কুবেরকে বিতাড়িত করে লঙ্কা অধিকার করল। কুবের কৈলাস-পর্বতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

তারপর দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্বের সঙ্গে ভগিনী শূর্পণখার বিবাহ দিল রাবণ। সে নিজে বিয়ে করল দানবরাজ ময়ের কন্যা মন্দোদরীকে। কুম্ভকর্ণের সঙ্গে বিয়ে হল দানবরাজ বৈরোচনের দৌহিত্রী বজ্রজ্বালার। আর, গন্ধর্বরাজ শৈলূষের কন্যাকে বিয়ে করল বিভীষণ।

কালক্রমে রাবণ ও মন্দোদরীর একটি পুত্র হল। জন্মমাত্র মেঘের গর্জন করে রোদন করতে লাগল সে। তাই তার নাম রাখা হল ঃ মেঘনাদ।

রাবণের দিগ্বিজয়

এবার সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাবণ বেরল দিগ্বিজয়ে।

প্রথমেই সে গিয়ে হানা দিল কৈলাস-পর্বতে কুবেরের ভবনে। কুবেরের যক্ষবাহিনী রাক্ষসদের হাতে পর্যুদস্ত হল; স্বয়ং কুবের রাবণের গদাঘাতে লুটিয়ে পড়ে হার মানলেন। তাঁর পুষ্পক-রথখানি হরণ করে নিল রাবণ।

কৈলাসেই দেবাদিদেব শঙ্করের ক্রীড়াভূমি। সেখানে গেল রাবণ। ভীষণ এক শূল হাতে নিয়ে সেই ক্রীড়াভূমি পাহারা দিচ্ছিলেন নন্দী। নন্দীর মুখখানি বানরের মত। তা দেখে রাবণ হেসে উঠল। নন্দী ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন তাকে ঃ "আমার বানরমুখ দেখে হাসলে তুমি, তাই বানরদের হাতেই তোমার বংশ ধ্বংস হবে।"

সে অভিশাপ উপেক্ষা করে রাবণ তার দু হাত দিয়ে কৈলাস-পর্বত তুলতে গেল। ভগবান্ শঙ্কর তাঁর পায়ের আঙুল দিয়ে চেপে ধরলেন পর্বতটি। ফলে, ভীষণ চাপ পড়ল রাবণের হাতে। অসহ্য যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করতে লাগল সে। অবশেষে অমাত্যদের পরামর্শে সে শঙ্করের স্তব করতে আরম্ভ করল।

স্তবে প্রসন্ন হলেন মহাদেব, বললেন ঃ "দশানন, তোমার বীরত্বে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। হাতে চাপ পড়ায় ভীষণ রব করেছিলে তুমি, তাই আজ থেকে রাবণ-নাম হবে তোমার।" এই বলে তিনি চন্দ্রহাস নামে একখানি দিব্য খড়্গ দিলেন রাবণকে।

কৈলাস থেকে রাবণ গেল উশীরবীজ-দেশে। সেখানে রাজা মরুত্তকে যুদ্ধে আহ্বান করল সে। মরুত্তও ধনুর্বাণ হাতে নিলেন। কিন্তু তাঁর পুরোহিতের উপদেশে তিনি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন। রাবণ যুদ্ধ না করেই জয়ী হল।

দুষ্মন্ত সুরথ গাধি গয় পুরূরবা প্রভৃতি নৃপতিরা বিনা যুদ্ধেই রাবণের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন। কিন্তু অযোধ্যারাজ অনরণ্য সসৈন্যে যুদ্ধ করতে এলেন। তাঁর বিক্রমে রাবণের সেনাপতিরা পলায়ন করল। তখন রাবণ বিষম এক চাপড় মারল অনরণ্যকে। সেই চাপড়ে রথ থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন অযোধ্যাপতি।

অনরণ্য অভিশাপ দিলেন রাবণকে: "দুরন্ত রাক্ষস, আমারই বংশধরের হাতে প্রাণ হারাবে তুমি।" এই বলে প্রাণত্যাগ করলেন তিনি। এই অনরণ্যেরই বংশধর হলেন রাম।

এবার যমপুরী আক্রমণ করল রাবণ। সেখানে উপস্থিত হয়ে সে দেখতে পেল যে, অকথ্য নির্যাতন ভোগ করছে পাপীরা। সে তখন পাপীদের মুক্ত করে দিল। যমের অনুচররা পরাজিত হল তার হাতে।

সংবাদ পেয়ে স্বয়ং যম এলেন যুদ্ধে। সাত দিন সাত রাত্রি ধরে তুমুল সংগ্রাম চলল যমে আর রাবণে। অবশেষে রাবণকে বধ করার জন্য অমোঘ কালদণ্ড হাতে নিলেন যম।

এমন সময়ে ব্রহ্মা এসে যমকে বললেন: "রাবণ আমার বরে দেবতাদের অবধ্য। তুমি তাকে বধ করলে বর আমার মিথ্যা হবে। অথচ, তোমার অমোঘ কালদণ্ডও ব্যর্থ হওয়া অনুচিত।"

এ কথা শুনে কালদণ্ড নিক্ষেপ না করেই রণস্থল পরিত্যাগ করলেন যম। রাবণের জয় হল।

তারপর মহাসমুদ্রের নিচে ভোগবতী-পুরীতে গিয়ে নাগদের বশে আনল রাবণ।

সেখান থেকে মণিময়-পুরীতে গিয়ে মহাবল নিবাতকবচদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করল রাবণ। যেমন রাবণ, তেমনি নিবাতকবচেরা,—উভয় পক্ষই সুরাসুরের অজেয়। তাই এক বৎসর ধরে ক্রমাগত যুদ্ধের পরও কোন পক্ষ জয়লাভ করতে পারল না। অবশেষে ব্রহ্মার অনুরোধে মৈত্রী স্থাপন করল তারা।

রাবণ এবার অশ্মনগরে গিয়ে কালকেয় নামে চার শ দৈত্য বধ করল। ঐ দৈত্যদের সঙ্গে শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুজ্জিহ্বও মারা পড়ল।

এইভাবে আপন ভগিনীকে বিধবা করার পর জলদেবতা বরুণের জয় করল রাবণ।

বরুণপুরী জয় করে ফেরার পথে অশ্মনগরে একটি আশ্চর্য ভবন দেখতে পেল সে। এক বিশালকায় কজ্জলবর্ণ পুরুষ ভবনটির দ্বাররক্ষা করছিলেন। তাঁকে দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল রাবণ।

পুরুষটি জিজ্ঞাসা করলেন রাবণকে: "তুমি কি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও? না, বলির সঙ্গে যুদ্ধ করবে?"

রাবণ কোনমতে বলল: "ঐ ভবনমধ্যে যিনি আছেন, তাঁরই সঙ্গে যুদ্ধ করব আমি।"

দ্বাররক্ষী পুরুষ বললেন: "ভবনমধ্যে আছেন দানবেন্দ্র বলি।" এই বলে তিনি পথ দেখিয়ে দিলেন রাবণকে।

রাবণ কাছে গেলে বলি সহাস্যে তাকে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : "বল, কি চাও, দশানন ?"

রাবণ বলল : "শুনেছি, বিষ্ণু তোমাকে বেঁধে রেখেছে। বল ত, আমি মুক্ত করি তোমাকে।"

বলি হেসে বললেন : "দ্বারে যে পুরুষকে দেখেছ, তিনিই বিষ্ণু। সর্বলোকের পালক উনি। তোমাকে আমাকে এবং সমস্ত বীরকেই দড়িবাঁধা পশুর মত চালনা করতে পারেন উনি। সমস্ত দৈত্য ও দানবকে সংহার করেছেন ঐ আশ্চর্য পুরুষ।"

সেই কক্ষে একটি কুণ্ডল পড়ে ছিল। রাবণকে সেই কুণ্ডলটি আনতে বললেন বলি। কুণ্ডলটি তুলতে গিয়ে রাবণ রক্তাক্তদেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন বলি বললেন : "ঐ কুণ্ডলটি ছিল আমার পূর্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুর। মহাবীর ছিলেন তিনি। তাঁকেও বধ করেছেন বিষ্ণু।"

এ কথা শুনে রাবণ অস্ত্র উদ্যত করে বলির দ্বাররক্ষী বিষ্ণুকে বধ করার জন্য ছুটে গেল। কিন্তু, রাবণের মরার সময় এখনও হয়নি, এই ভেবে বিষ্ণু অন্তর্হিত হলেন। রাবণ নিজেকে বিজয়ী মনে করে সহর্ষে সিংহনাদ করতে করতে প্রস্থান করল।

সূর্যকেও পরাজিত করল রাবণ। তারপর তার সঙ্গে দেখা হল অযোধ্যাপতি মান্ধাতার। মান্ধাতা তাঁর মৃত্যুর পর স্বর্গে যাচ্ছিলেন। রাবণ তাঁকে গিয়ে বলল : "রণং দেহি"—যুদ্ধ কর আমার সঙ্গে। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল দুজনে। শেষে মহর্ষি পুলস্ত্য ও গালবের চেষ্টায় সন্ধি স্থাপিত হল তাদের মধ্যে।

চন্দ্রলোকে গিয়ে চন্দ্রকে পরাজিত করার পর রাবণ গেল পশ্চিম সমুদ্রের দ্বীপে। সেখানে এক কাঞ্চনবর্ণ অগ্নিপ্রভ পুরুষকে দেখতে

পেয়ে তাঁকে আক্রমণ করল সে। সেই মহাপুরুষ হাত দিয়ে রাবণকে নিষ্পিষ্ট করে ভূমিতে ফেলে দিলেন, তারপর এক গহ্বরের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। রাবণও নির্ভয়ে সেই গহ্বরে প্রবেশ করল।

গহ্বরমধ্যে এক মহাপুরুষ নিদ্রা যাচ্ছিলেন। লক্ষ্মীদেবী চামর দিয়ে বীজন করছিলেন তাঁকে। রাবণ লক্ষ্মীদেবীকে ধরতে গেল। তা দেখে সেই মহাপুরুষ অট্টহাস্য করে উঠলেন। সেই হাসির ধাক্কায় ছিটকে ভূপতিত হল রাবণ।

ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে রাবণ পুরুষটিকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "আপনি কে, প্রভু ? যদি মরতে হয়, তবে যেন আপনার হাতেই মরি,—সে মরণ যশের হবে !"

ঐ মহাপুরুষ হলেন ভগবান্ কপিল, তাঁর অপর নাম ঃ নর।

এবার লঙ্কায় ফিরে এল রাবণ। ভগিনী শূর্পণখার বৈধব্যে ব্যথিত হল সে। তাই সে তার মাসতুত ভাই খরকে পাঠাল জনস্থানের রাজা করে ; তার সঙ্গে দিল চোদ্দ হাজার রাক্ষস-সৈন্য। তারপর সে শূর্পণখাকে সান্ত্বনা দিয়ে খরের কাছে পাঠিয়ে দিল, আর খরকে বলে পাঠাল ঃ সে যেন সর্বদা শূর্পণখার আদেশ মেনে চলে।

তারপর সৈন্য সাজিয়ে রাবণ যাত্রা করল দেবরাজ ইন্দ্রের পুরী আক্রমণ করতে। দেবতায় ও রাক্ষসে তুমুল যুদ্ধ হতে লাগল। অসংখ্য রাক্ষস মারা পড়ল। এমন কি, ইন্দ্রের বাহিনী ঘিরে ফেলল রাবণকে ; জীবনসংশয় হয়ে উঠল তার।

রাবণের পুত্র মেঘনাদ তপস্যাবলে আকাশে অদৃশ্য হয়ে যুদ্ধ করতে পারত। পিতার সঙ্কট দেখে মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করল সে। আকাশে অদৃশ্য হয়ে শরবর্ষণ করে ইন্দ্রকে সে বেঁধে ফেলল। বন্দী ইন্দ্রকে নিয়ে রাবণ সদলে লঙ্কায় ফিরল।

তখন ব্রহ্মা অন্তরীক্ষ থেকে রাবণকে বললেন ঃ “বৎস দশানন, তোমার পুত্র মেঘনাদ ইন্দ্রকে পরাজিত করে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেছে। আজ থেকে তার নাম হবে ঃ ইন্দ্রজিৎ। এখন দেবরাজ ইন্দ্রকে মুক্তি দাও তুমি।”

ইন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হল বটে, কিন্তু তার আগে ব্রহ্মার কাছে এই বর আদায় করে নিল ইন্দ্রজিৎ যে, নিকুম্ভিলায় অগ্নির পূজা করে যুদ্ধে গেলে সে হবে অজেয় ও অবধ্য কিন্তু সে যদি পূজা অসমাপ্ত রেখে যুদ্ধযাত্রা করে, তবে প্রাণ হারাবে।

রাবণের দর্পচূর্ণ ও হনুমানের পূর্ববৃত্তান্ত

রাম জিজ্ঞাসা করলেন অগস্ত্যমুনিকে ঃ “রাবণকে দমন করার মত বীর কি কেউ ছিলেন না সেকালে ?”

“ছিলেন বৈকি !” বললেন অগস্ত্য, “বলবানের চেয়েও বলবান্ থাকে। রাবণেরও পরাজয় ঘটেছিল। শোন সে কাহিনী।”

অগস্ত্য বলতে লাগলেন ঃ হৈহয়-রাজ্যের অধিপতি কার্তবীর্যার্জুন ছিলেন মহাবীর। হাজারখানি হাত ছিল তাঁর। মাহিষ্মতী-নগরীতে ছিল তাঁর রাজধানী। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল লঙ্কেশ্বর রাবণ।

সহস্রবাহু কার্তবীর্যার্জুনের সঙ্গে বিষম যুদ্ধ হতে লাগল বিংশতিবাহু রাবণের। পরিশেষে কার্তবীর্যার্জুন হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বন্দী করলেন রাবণকে। সেদিনই প্রাণ যেত দশাননের যদি না মহর্ষি পুলস্ত্যের অনুরোধে তাকে মুক্তি দিতেন হৈহয়রাজ।

আরেকবার রাবণ যায় কিষ্কিন্ধ্যায় বানররাজ বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে রাবণ শুনল যে, বালী গেছেন চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যাবন্ধনা করতে। দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব—এই চার সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে নিত্য উপাসনা করতেন বালী।

দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়ে বালীর দেখা পেল রাবণ। হিমালয়-পর্বতের মত বিরাট্ দেহ বালীর, প্রভাত-সূর্যের মত তাঁর মুখে জ্যোতি! চক্ষু বুজে নিশ্চল হয়ে মন্ত্র জপ করছিলেন তিনি।

বালীকে সহসা পিছন থেকে ঝাপটে ধরার সঙ্কল্প করল রাবণ। তাই সে নিঃশব্দচরণে অগ্রসর হল। কিন্তু বালী তার আগমন টের পেলেন, তার উদ্দেশ্যও বুঝতে পারলেন। তথাপি তিনি নীরব নিশ্চল হয়েই রইলেন।

রাবণ কাছে আসতেই বালী মুখ না ফিরিয়েই হাত বাড়িয়ে তাকে ধরলেন ; তারপর তাকে বগলে চেপে ধরে উঠলেন আকাশে। শত চেষ্টা করেও রাবণ মুক্ত হতে পারল না বালীর কবল থেকে। রাবণকে বগলে চেপে রেখেই বালী একে একে চার সমুদ্রে গিয়ে সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করলেন। তারপর তিনি মুক্ত করে দিলেন দশাননকে।

মুক্তি পেয়ে ভয়ে বিস্ময়ে বালীর দিকে তাকিয়ে রইল রাবণ। তারপর সে বানররাজের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে ফিরে গেল লঙ্কায়।

এই প্রসঙ্গে অগস্ত্যকে বললেন রাম : "আমার মনে হয়, রাবণ ও বালীর চেয়েও ঢের বেশী শক্তিধর হনুমান। তার শৌর্য দক্ষতা বল ধৈর্য বুদ্ধি নীতিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের তুলনা নেই। তারই সাহায্যে লঙ্কাজয় করে সীতার উদ্ধার করতে পেরেছি আমি। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না : বালী-সুগ্রীবের বিরোধের সময়ে বালীকে কেন বধ করেনি সে ?"

রামের কথা মেনে নিয়ে অগস্ত্য বললেনঃ হনুমান সত্যই অসামান্য শক্তির অধিকারী। বায়ু-দেবতা পবনের বরপুত্র সে। তার পিতার নামঃ কেশরী, মাতার নামঃ অঞ্জনা।

জন্মমাত্রই ক্ষুধায় রোদন করতে থাকে হনুমান। তার মা অঞ্জনা সন্তানের জন্য ফল আনতে যায় অরণ্যে। এমন সময়ে সূর্যোদয় হল। নবোদিত সূর্যকেই ফল মনে করে তাকে ধরার জন্য হনুমান লাফ দিয়ে উঠল আকাশে।

সেদিন ছিল সূর্যগ্রহণ। রাহু গ্রাস করতে গিয়েছিল সূর্যকে। হনুমান রাহুকে আক্রমণ করল। বিপাকে পড়ে রাহু দেবরাজ ইন্দ্রকে ডাকতে থাকে। ইন্দ্র এসে বজ্র ছুড়ে মারেন হনুমানকে। বজ্রাঘাতে হনুমানের বাম হনু ভগ্ন হল। নিচে পর্বতের উপর পড়ে গেল সে।

বরপুত্রের অবস্থা দেখে অত্যন্ত শোকার্ত হলেন বায়ু-দেবতা পবন। সর্বলোকে বাতাস বন্ধ করে দিলেন তিনি। বায়ুর অভাবে সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হল।

তখন ব্রহ্মা এসে অনেক প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলেন পবনকে। আবার বাতাস বইতে লাগল।

পবনের শোক দূর করার জন্য সমস্ত দেবতারা নানা বর দিলেন হনুমানকে। সেই সব বরের ফলে সে হল অমর ও অজেয়; ইচ্ছামত রূপধারণ ও বিচরণের ক্ষমতা হল তার; তার গতি হল অবাধ; সর্ব শাস্ত্রে তার গভীর জ্ঞান জন্মাল; পাণ্ডিত্যে বুদ্ধিতে বাগ্মিতায় শৌর্যে বীর্যে সে হল অদ্বিতীয়। আর, বজ্রাঘাতে তার হনুভঙ্গ হয়েছিল বলে দেবরাজ ইন্দ্র তার নাম রাখলেনঃ হনুমান।

দেবতাদের বরে বলীয়ান্ হয়ে ঋষিদের আশ্রমে নিরন্তর উপদ্রব করে বেড়াতে লাগল হনুমান। ঋষিরা তাই তাকে অভিশাপ দেন যে, বহুকাল সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে অচেতন থাকবে।

হনুমানের পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করে অগস্ত্য বললেন: “ঐ অভিশাপের জন্যই বালীকে বধ করেনি হনুমান, কারণ সে তখন তার নিজের শক্তি সম্বন্ধে অচেতন ছিল। সমুদ্রলঙ্ঘনের সময় থেকে সে আবার নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়।”

অগস্ত্যাদি মুনিরা অযোধ্যা ত্যাগ করার কিছু কাল পরে সমস্ত বানর ও রাক্ষস এবং অন্যান্য অতিথিগণ রামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজ নিজ দেশে প্রস্থান করলেন।

সীতার বিসর্জন

কিছু কাল গেল। সন্তানসম্ভবা হলেন সীতা। রাম পরমানন্দিত হলেন, সীতাকে জিজ্ঞসা করলেন: তাঁর মনে কি সাধ জাগছে?

সীতা বললেন: গঙ্গাতীরের পবিত্র তপোবনগুলিতে এক রাত্রি যাপন করতে চান তিনি।

রাম কথা দিলেন: পরদিনই যাতে সীতার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তার ব্যবস্থা করা হবে।

সেদিনই একটা অতি বিশ্রী অত্যন্ত হীন জনরব কানে এল রামের। সীতার চরিত্রে সন্দেহ করছে অযোধ্যার লোক, বলছে তারা: রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে দীর্ঘকাল রেখেছিল লঙ্কায়; সুতরাং, বিশ্বাস কি, সীতার চরিত্র ত নষ্ট হতে পারেই।

এই জনরব কানে আসতে দুঃখে ক্ষোভে লজ্জায় ক্রোধে অন্তর ছেয়ে গেল রামের। হায় হায়, কেন সীতার অগ্নিপরীক্ষার সময়ে অযোধ্যাবাসীদের লঙ্কায় নিয়ে যাননি তিনি? অথবা, কেন

অযোধ্যায় ফিরে এসে অগ্নিপরীক্ষা করেননি সীতার? এখন তিনি কি বলবেন তাঁর সতীলক্ষ্মী স্ত্রীকে?

কিন্তু উপেক্ষা করা ত চলবে না এই জনরবকে। বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম রামের। সে বংশে কোনদিন কোন কলঙ্ক স্পর্শ করেনি,—এখনও স্পর্শ করতে দেওয়া হবে না। জনরব যখন উঠেছে, প্রতিকার তখন করতেই হবে। কিন্তু কি প্রতিকার? আবার অগ্নিপরীক্ষা? না-না, সে অসম্ভব—অত নিষ্ঠুর হতে পারবেন না রাম।

অবশেষে ভাইদের ডেকে পাঠালেন তিনি। তাঁদের সব কথা জানিয়ে তিনি বললেন, "আমি জানি: কোন পাপ স্পর্শ করেনি সীতাকে—কোন দোষ নেই তাঁর চরিত্রে। তবু আমাদের বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুবংশের সুনাম রক্ষার জন্য বিসর্জন দিতে হবে তাঁকে।" বলতে বলতে রামের দু চোখ জলে ভরে গেল, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হল তাঁর।

একটু থেমে সামলে নিলেন রাম। তাঁর তিন ভাই পাথরের মত নিশ্চল হয়ে শুনছিলেন তাঁর কথা। একি দুর্ভাগ্য সীতার!

রাম আবার বলতে লাগলেন লক্ষ্মণকে: "লক্ষ্মণ, সীতার সাধ হয়েছে গঙ্গাতীরে মুনিদের তপোবনে একটি রাত যাপন করার জন্য। আজই সে সাধ প্রকাশ করেছেন তিনি। তুমি যাও, কালই চিরতরে সেখানে রেখে এস তাঁকে। প্রতিবাদ করো না, ভাই, রুষ্ট হয়ো না,—আমার শোক আর বাড়িয়ো না।"

চাপা ক্রোধে চোখদুটি রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল লক্ষ্মণের, কিন্তু রামের মুখের দিকে তাকিয়ে সে ক্রোধ সংবরণ করলেন তিনি।

পরদিন প্রভাতে মুনিদের আশ্রম দেখাবার নাম করে সীতাকে নিয়ে যাত্রা করলেন লক্ষ্মণ।
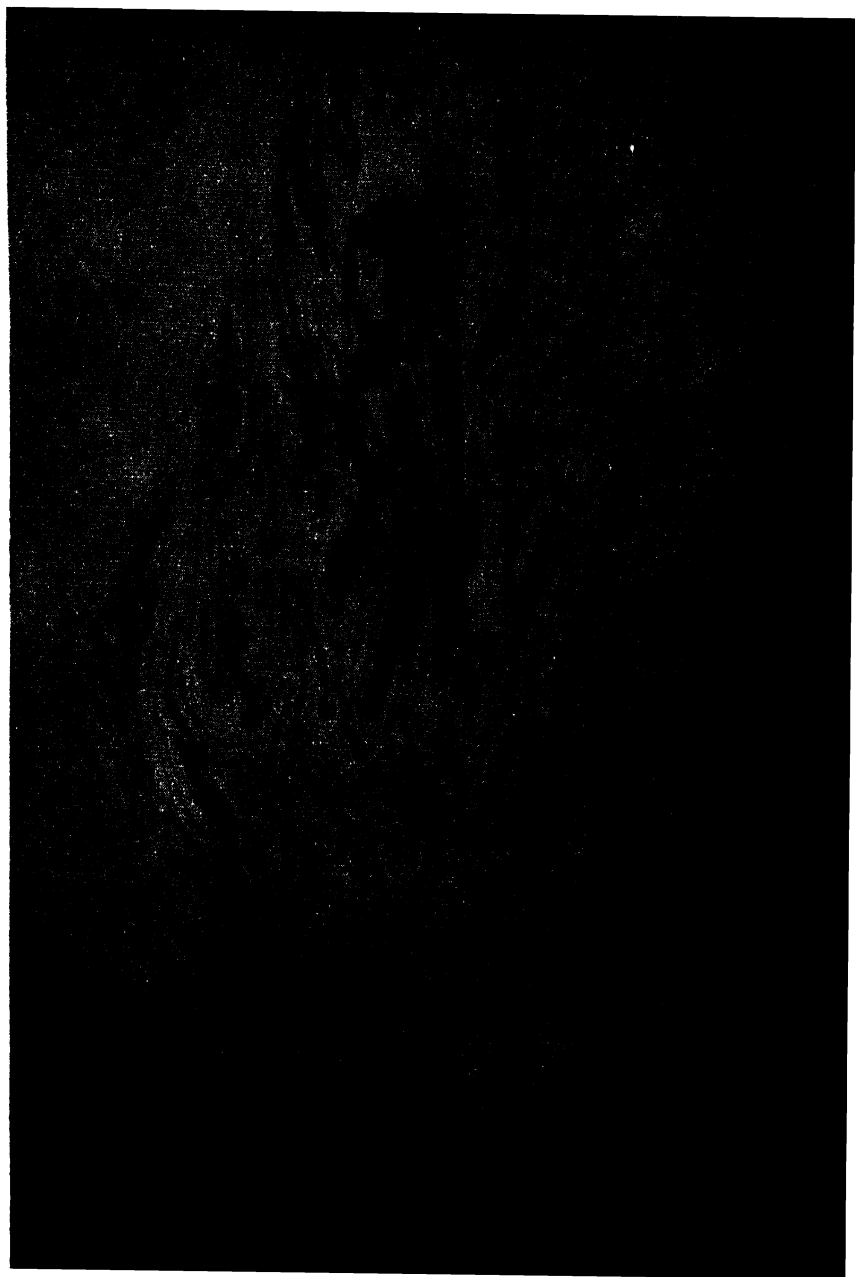
গঙ্গার অপর পারে শত শত মুনির তপোবন। সেখানে পৌঁছে লক্ষ্মণ সীতাকে বললেন: "দেবী, আজ আমি যে কাজ করতে এসেছি, তার জন্য চিরকাল আমার অপযশ রইবে পৃথিবীতে। দেবী আপনি, পুণ্যবতী আপনি, আপনি সতী, অপরাধ নেবেন না আমার,—আজ মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ।" এই বলে ভূলুণ্ঠিত হলেন লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণের কথা শুনে সীতা উদ্বিগ্ন হলেন, বললেন: "আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না! ব্যাপার কি?"

লক্ষ্মণ তখন বহু কষ্টে সব কথা খুলে বললেন। শুনে মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে সকাতরে বিলাপ করতে লাগলেন সীতা। লক্ষ্মণ তাঁকে ঐ অবস্থায় রেখে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

গঙ্গা পেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালেন লক্ষ্মণ। বারংবার ওপারে ভূলুণ্ঠিতা সীতাকে দেখতে লাগলেন তিনি। তাঁর দু চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নামল। ওপারে পুণ্যবতী সীতার চোখে জল, এপারে পূতচরিত্র লক্ষ্মণের চোখে জল, মাঝে জল পুণ্যতোয়া গঙ্গার বুকে!

মহামুনি বাল্মীকির আশ্রমও গঙ্গার ওপারেই। লক্ষ্মণ চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে তিনি এসে উপস্থিত হলেন সীতার কাছে। সব বৃত্তান্ত শুনে সীতাকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গেলেন তিনি। সেখানে তাপসীদের ডেকে সীতার পরিচয় দিলেন, তাঁদের আদেশ করলেন: তাঁরা যেন সযত্নে রক্ষা করেন জানকীকে।

গঙ্গার অপর পার থেকে লক্ষ্মণ দেখলেন সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে প্রবেশ করতে। অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকে অনাথার ন্যায় বিসর্জন দিয়ে জীবন্মৃতের মত রথে উঠে বসলেন তিনি।

লক্ষ্মণের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে রামের আর শোকের অবধি রইল না। মনের কষ্টে চারদিন পর্যন্ত কোন রাজকার্য করতে পারলেন না তিনি।

লবণাসুর-বধ ও লবকুশের জন্ম

একদিন মহর্ষি চ্যবনকে সঙ্গে নিয়ে যমুনাতীরবাসী কয়েকজন তপস্বী এলেন রামের সভায়। রামকে তাঁরা জানালেন যে, মহাশক্তিধর লবণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জনসাধারণ, বিশেষতঃ তপস্বীরা।

লবণাসুরের পরিচয় জানতে চাইলেন রাম। চ্যবন বললেন: "সত্যযুগে মধু নামে এক দৈত্য ছিল। অত্যন্ত ধার্মিক এবং দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ছিল সে। মহাদেব তাকে একটি অমোঘ শূল দেন। এই মধুরই পুত্র হল লবণ। নিষ্ঠুরতাই তার স্বভাব। পিতার মৃত্যুর পর শিবদত্ত শূল পেয়ে দুর্বার হয়ে উঠেছে সে। দুষ্ট রাত্রিদিন অত্যাচার করে বেড়াচ্ছে যমুনাবাসীদের উপরে, বিশেষতঃ তপস্বীরা ত তার চক্ষুশূল!"

এ কথা শুনে রাম শত্রুঘ্নকে বললেন: "শত্রুঘ্ন, সৈন্য নিয়ে মধুপুরে যাও তুমি, লবণকে বধ করে সেখানে তোমার রাজ্য স্থাপন কর। আমি এখনই তোমাকে ঐ রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করব।"

রামের আদেশে যথাবিধি অভিষেক হল শত্রুঘ্নের। রাম তাঁকে একটি দিব্য শর দিয়ে বললেন: "শত্রুঘ্ন, এই শর দিয়েই পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু বধ করেছিলেন মধু-কৈটভ নামে দুই দৈত্য-ভ্রাতাকে। এই শর দিয়েই তুমি বধ করতে পারবে লবণকে।"

রাম আরও বললেন: "লবণ যখন তার আহার সংগ্রহের জন্য শিকার করতে যায়, তখন সে শিবদত্ত শূলটি নিয়ে যায় না—সেটি তখন তার ঘরেই থাকে। সে শিকার থেকে ফিরে তার ঘরে ঢোকার আগেই তাকে বধ করো তুমি, কারণ তার শৈবশূল থাকলে তাকে পরাস্ত করা বা বধ করা যাবে না।"

রামের পরামর্শমত শত্রুঘ্ন তখনি সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন মধুপুরে লবণের রাজ্যে, সেখানে উপযুক্ত শিবিরাদি স্থাপন করার জন্য। একমাস পরে তিনি নিজেও যাত্রা করলেন মধুপুরে।

পথে গঙ্গা পেরিয়ে বাল্মীকির আশ্রমে এক রাত্রির জন্য আতিথ্য গ্রহণ করলেন শত্রুঘ্ন।

নির্বাসিতা সীতাও ছিলেন বাল্মীকির আশ্রমে। সেদিনই মধ্যরাত্রে ছুটি যমজ পুত্র প্রসব করলেন তিনি। তাদের মধ্যে যেটি অগ্রে ভূমিষ্ঠ হল, বাল্মীকি তার নাম রাখলেন: কুশ; অন্যটির নামকরণ করলেন: লব অর্থাৎ কুশগুচ্ছের মূলদেশ।

সংবাদ শুনে পরমানন্দিত হলেন শত্রুঘ্ন। কিন্তু রামের অনুমতি ছিল না বলে তিনি না পারলেন সীতার সঙ্গে দেখা করতে, না পারলেন ছেলে ছুটিকে একবার কোলে নিতে!

রাত্রি প্রভাত হতেই বাল্মীকির কাছ থেকে বিদায় নিলেন শত্রুঘ্ন। সাতদিন পরে তিনি উপস্থিত হলেন মধুপুরে।

মধুপুরে পৌঁছে চ্যবনমুনির সঙ্গে দেখা করলেন শত্রুঘ্ন, জিজ্ঞাসা করলেন লবণের বলাবলের কথা।

চ্যবন বললেন: "তোমাদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন মহারাজ মান্ধাতা। ইন্দ্রের সিংহাসনে ভাগ বসাতে ইচ্ছা হল তাঁর। ইন্দ্র

ভীত হয়ে বললেন মান্ধাতাকে : 'নরলোক সম্পূর্ণ জয় না করেই কেন আসছ স্বর্গলোক অধিকার করতে?' দিগ্বিজয়ী মান্ধাতা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন দেবরাজকে : 'পৃথিবীর কোন্ অংশ জয় করিনি আমি?' ইন্দ্র বললেন : লবণ ত এখনও মান্ধাতার বশ্যতা স্বীকার করেনি।"

চ্যবন বলতে লাগলেন : "মান্ধাতা তখনি মধুপুরে গিয়ে আক্রমণ করলেন লবণকে। কিন্তু লবণ তার শৈবশূল নিক্ষেপ করামাত্র সসৈন্যে ভস্মীভূত হলেন মান্ধাতা। শূলটি আবার ফিরে গেল লবণের হাতে।"

পরদিন লবণ শিকারে বেরলে শত্রুঘ্ন ধনুঃশর হাতে নিয়ে মধুপুরের দ্বারদেশ রোধ করে দাঁড়ালেন।

দুপুরবেলা রোদে তেতে-পুড়ে ফিরে এল লবণ। হাজার প্রাণী মেরে নিজেই সেগুলি বয়ে এনেছে সে। নিজের ঘরের দরজায় আসতেই শত্রুঘ্ন তাকে বললেন : "রণং দেহি"—যুদ্ধ কর আমার সঙ্গে।

শৈবশূলটি আনার জন্য ঘরের মধ্যে ঢুকতে চাইল লবণ, কিন্তু তাকে ঢুকতে দিলেন না শত্রুঘ্ন।

কিন্তু বিনা শূলেই লবণের বিক্রম দেখে কে? বড় বড় গাছ উপড়ে নিয়ে সে ছুড়ে মারতে লাগল শত্রুঘ্নকে; শত্রুঘ্ন কোনমতে শরাঘাতে সে গাছগুলি কেটে ফেলতে লাগলেন। শেষে মস্ত একটা গাছ দিয়ে শত্রুঘ্নের মাথায় বিষম আঘাত করল লবণ। সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন শত্রুঘ্ন। হাহাকার করে উঠল যুদ্ধ দেখতে এসেছিল যারা।

লবণ ভাবল : শত্রুঘ্ন মারা গেছেন। তাই সে আর ঘরের ভিতর

থেকে শৈবশূল আনার উদ্যোগ করল না। যে সব প্রাণী সে শিকার করে এনেছিল, ধীরেসুস্থে তুলতে লাগল সেগুলিকে।

এমন সময়ে চেতনা ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন শত্রুঘ্ন। আর বিলম্ব করলেন না তিনি—রামের দেওয়া অমোঘ বিষ্ণুশর নিক্ষেপ করলেন লবণের প্রতি। সেই ভয়ঙ্কর বাণ লবণের প্রাণহরণ করে তখনি আবার ফিরে এল শত্রুঘ্নের হাতে। লবণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শৈবশূলও ফিরে গেল শিবের কাছে।

লবণবধের পর বার বছরের মধ্যে মধুপুরে এক সমৃদ্ধ রাজ্য স্থাপন করলেন শত্রুঘ্ন। তারপর তিনি ফিরে এলেন অযোধ্যায় রামের সঙ্গে দেখা করতে। শত্রুঘ্নকে দেখে আহ্লাদিত হলেন রাম, কিন্তু তাঁকে বেশি দিন থাকতে দিলেন না অযোধ্যায়, কারণ তাহলে মধুপুরের রাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটবে। তাই সাতদিন পরেই আবার শত্রুঘ্ন ফিরে গেলেন মধুপুরে।

সীতার রসাতলে প্রবেশ

কয়েক বছর পরে। সর্বপাপনাশন অশ্বমেধ-যজ্ঞের আয়োজন করলেন রাম। সুলক্ষণ একটি ঘোড়াকে বলি দিতে হয় এই যজ্ঞে।

রামের নিমন্ত্রণ পেয়ে দেশবিদেশের বহু লোক উপস্থিত হলেন অযোধ্যায়। মুনি-ঋষি রাজ-রাজড়া বণিক্ শিল্পী নট ভিক্ষুক প্রভৃতি কত রকমের লোকই না এল! কিষ্কিন্ধ্যা থেকে এলেন সুগ্রীব বানরদের নিয়ে, লঙ্কা থেকে এল রাক্ষসেরা বিভীষণের সঙ্গে। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল অযোধ্যা।

মহর্ষি বাল্মীকিও এলেন। তাঁর সঙ্গে এল শিষ্যেরা, আর এল

কুশ ও লব। মহর্ষি তাঁর রচিত রামায়ণ গান করতে শিখিয়েছিলেন কুশ ও লবকে, কিন্তু তাদের পিতৃপরিচয় জানাননি।

অযোধ্যায় এসে কুশ ও লবকে বললেন বাল্মীকি: "বৎস, তোমরা নগরীর সর্বত্র রামায়ণ গান করে বেড়াও। কেউ যদি তোমাদের পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তবে তাকে বলো যে, তোমরা আমার শিষ্য। আর দেখ, রাম ধর্মতঃ সকলের পিতা—তাঁকে অসম্মান করবে না কখনও।"

বাল্মীকির আদেশে রামায়ণ গান করে বেড়াতে লাগল কুশ ও লব। তাদের মধুর কণ্ঠে মধুরতর হয়ে উঠল বাল্মীকির রচিত রামায়ণ। সবাই মুগ্ধ হল সে গান শুনে। রামের কানেও সে সুললিত ধ্বনি পৌঁছল। বালকদুটিকে যজ্ঞস্থলে ডাকিয়ে আনালেন তিনি।

যজ্ঞস্থলে এসে রামায়ণ গান করতে লাগল কুশ ও লব। গান শুনে রোমাঞ্চিত হলেন সকলে। দু চোখ ভরে তাঁরা দেখতে লাগলেন অনুপম রূপলাবণ্যময় বালকদুটিকে।

গান শেষ হলে রাম প্রচুর সুবর্ণ পারিতোষিক দেবার আদেশ দিলেন কুশ ও লবকে। কিন্তু বাল্মীকির উপদেশমত সে পারিতোষিক গ্রহণ করল না তারা। রামের প্রশ্নের উত্তরে তারা বলল যে, রামায়ণের রচয়িতা হলেন তাদের গুরু মহর্ষি বাল্মীকি।

এ কথা শুনে এবং বালকদুটির আকৃতি-প্রকৃতি দেখে রামের ধারণা হল যে, তারা নিশ্চয়ই সীতার পুত্র। তখন তিনি বাল্মীকিকে বলে পাঠালেন যে, সীতা যদি শুদ্ধচরিত্রা হন, তবে মহর্ষির অনুমতি নিয়ে যজ্ঞস্থলে এসে পরীক্ষা দিন তিনি।

বাল্মীকি উত্তর পাঠালেন: পতিই সতীর দেবতা, সুতরাং অবশ্যই রামের ইচ্ছা পূর্ণ করবেন সীতা।

পরদিন। সীতার পরীক্ষা দেখতে সবাই উপস্থিত হয়েছেন যজ্ঞস্থলে।

বাল্মীকি এলেন যজ্ঞস্থলে। তাঁর পিছনে পিছনে এলেন সীতা নতমুখে করজোড়ে রামের ধ্যান করতে করতে।

রামকে বললেন বাল্মীকি ঃ "রাম, জীবনে আমি মিথ্যা কখনও বলেছি বলে ত মনে পড়ে না। আমি বলছি ঃ সীতার চরিত্র নিষ্কলুষ—কুশ ও লব তোমারই সন্তান। তুমি মিথ্যা জনরবের ভয়ে অন্যায়ভাবে ত্যাগ করেছ সীতাকে।"

রাম বললেন ঃ "মহর্ষি, আপনার প্রতিটি কথা আমি বিশ্বাস করি। সীতা যে শুদ্ধচরিত্রা, তাতে সন্দেহ নেই। সত্যই, জনরবে ভীত হয়ে বিনা দোষে ত্যাগ করেছিলাম সীতাকে। আপনি ক্ষমা করুন আমাকে।"

এমন সময়ে সীতা কৃতাঞ্জলি হয়ে নতমুখে নতনেত্রে বলে উঠলেন ঃ "আমি যদি সত্যই পতিব্রতা হই, সত্যই আমি যদি হই সতী, তবে, হে মা বসুন্ধরা, বিদীর্ণ হয়ে আশ্রয় দাও আমাকে।"

সীতা একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটল। ভূতল বিদীর্ণ হয়ে গেল। সেই গহ্বরের ভিতর থেকে উঠে এল মহাতেজা দিব্য নাগগণ। নাগেদের মাথায় এক দিব্য সিংহাসনে বসে আছেন ধরিত্রী। দেবী ধরিত্রী দু হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিলেন চিরদুঃখিনী সীতাকে। পরক্ষণেই সীতা, ধরিত্রীদেবী, দিব্য সিংহাসনবাহী দিব্য নাগগণ,—সবাই অন্তর্হিত হয়ে গেলেন সেই গহ্বর-পথে।

সভার লোক চমৎকৃত হল, বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে 'ধন্য ধন্য' করতে লাগল সীতাকে। কেবল রাম শোকে উন্মাদ হয়ে উঠলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা এসে অনেক প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলেন তাঁকে।

লক্ষ্মণ-বর্জন

অবিরাম গতিতে বয়ে চলে কাল। কারও দুঃখকষ্ট দেখে থমকে দাঁড়ায় না সে। তাই সীতার রসাতলে প্রবেশের পর রামের শোক অগ্রাহ্য করে কেটে গেল বহু কাল। ক্রমে ক্রমে দশরথের তিন রানী দেহত্যাগ করলেন।

রামের শাসনে পরম সুখে আছে প্রজারা। সবাই বলছেঃ এমন রাজা আর হয়নি, হবেও না কোনদিন!

ভরতের দুই ছেলে—তক্ষ ও পুষ্কল। রামের আদেশে সিন্ধুনদের তীরে গন্ধর্বদের দেশ গান্ধার জয় করলেন ভরত। তারপর তিনি সে দেশে দুটি রাজ্য স্থাপন করলেন। একটির নাম হলঃ তক্ষশিলা, সেখানকার রাজা হলেন তক্ষ; অপরটির নামঃ পুষ্কলাবতী, পুষ্কল শাসন করতে লাগল সে রাজ্য।

লক্ষ্মণেরও দুই ছেলে—অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু। কারুপথ দেশে অঙ্গদীয়া নামে এক রাজ্য স্থাপন করে অঙ্গদকে সেখানকার শাসনভার দিলেন রাম, আর মল্লভূমিতে চন্দ্রকান্তা নামে রাজ্য স্থাপন করে দিলেন চন্দ্রকেতুকে।

কাটল আরও কিছু কাল।

একদিন এক তাপস এসে রামকে জানালেন যে, তিনি গুরুতর কোন বিষয়ে গোপনে আলাপ করতে এসেছেন অযোধ্যাপতির সঙ্গে, এবং কেউ যদি সে আলাপ শোনে বা আলাপের সময়ে তাঁদের দেখে ফেলে, তবে তার প্রাণদণ্ড হওয়া চাই।

তাপসের দীপ্ত মূর্তি দেখে আকৃষ্ট হলেন রাম। লক্ষ্মণকে ডেকে সব জানিয়ে বললেন তিনিঃ "তুমি যাও, রক্ষীকে সরিয়ে দিয়ে নিজে

পাহারা দাও এই কক্ষের দ্বারে। কেউ যদি আমাদের আলোচনা শুনে ফেলে বা আমাদের দেখে ফেলে, তবে প্রাণদণ্ড হবে তার।"

রামের আদেশমত রক্ষীকে সরিয়ে দিয়ে লক্ষ্মণ নিজে সেই কক্ষের দ্বার রক্ষা করতে লাগলেন।

তখন তাপস রামকে বললেন ঃ "রাম, আমি সর্বসংহারক কাল। ব্রহ্মা পাঠিয়েছেন আমাকে। তুমি ত সাধারণ মানুষ নও—তুমি হলে স্বয়ং বিষ্ণু। রাক্ষস বধ করে সৃষ্টিরক্ষার জন্য মানুষ হয়ে জন্মেছ তুমি। তা রাক্ষসবধ কার্য ত সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং, আর কেন? এবার দেহ ত্যাগ করে স্বর্গে ফিরে চল।"

কালের নির্দেশ মানতে সম্মত হলেন রাম।

কালের সঙ্গে নিভৃতে বসে আলাপ করছেন রাম, এমন সময়ে মহর্ষি দুর্বাসা সেই কক্ষদ্বারে এসে অবিলম্বে দেখা করতে চাইলেন রামের সঙ্গে।

লক্ষ্মণ তাঁকে অপেক্ষা করবার জন্য কত অনুনয় করলেন, কিন্তু কিছুতেই কর্ণপাত করলেন না দুর্বাসা। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বললেন লক্ষ্মণকে ঃ "হয় আমার আগমন-সংবাদ দাও রামকে, নয়ত সবংশে বিনষ্ট হবে তোমরা—ধ্বংস হবে তোমাদের রাজ্য।"

লক্ষ্মণ আর কি করেন! ক্রোধনস্বভাব দুর্বাসামুনির অভিশাপকে দেবতারা পর্যন্ত ভয় করেন! লক্ষ্মণ বিরসমুখে কক্ষে প্রবেশ করে রামকে দুর্বাসার আগমন-সংবাদ দিলেন। রাম তখনই কালকে বিদায় দিয়ে দুর্বাসার সঙ্গে দেখা করলেন। দুর্বাসা রামের কাছে আহার্য চাইলেন। রাম পরিতৃপ্ত করে ভোজন করালেন মুনিকে।

মুনি বিদায় নিলে রামের মনে পড়ল কালের শর্ত, মনে পড়ল নিষেধাজ্ঞার কথা। বুঝলেন তিনি ঃ এবার তাঁকে হারাতে হবে

আবাল্যের সহচর, সুখদুঃখে চিরসঙ্গী, প্রাণাধিক প্রিয় ভাই লক্ষ্মণকে। মনঃকষ্টে মৌনাবলম্বন করলেন রাম।

রামের অন্তরের ভাব বুঝতে পেরে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে লক্ষ্মণ বললেন: "ভ্রাতঃ, শোকার্ত হবেন না। আপনি প্রতিজ্ঞাপালন করুন—বর্জন করুন আমাকে, প্রসন্নমুখে বিদায় দিন।"

এই বলে তখনি রামকে প্রণাম করে সজলনয়নে সরযূ-নদীর তীরে গেলেন লক্ষ্মণ। সেখানে শ্বাস বন্ধ করে ধ্যান করতে লাগলেন তিনি। তখন দেবরাজ ইন্দ্র এসে অদৃশ্যভাবে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে গেলেন লক্ষ্মণকে।

সীতাহারা হয়েই রামের জীবনের সকল সুখশান্তি অন্তর্হিত হয়েছিল। এবার লক্ষ্মণকে হারিয়ে তাঁর কাছে জগৎ-সংসার শূন্য হয়ে গেল একেবারে। কালের কথা স্মরণ করে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করলেন তিনি।

তখন তিনি কুশকে উত্তর কোশলের এবং লবকে দক্ষিণ কোশলের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। তারপর তিনি দ্রুতগামী দূত পাঠিয়ে দিলেন মধুপুরে শত্রুঘ্নের কাছে।

দূতের মুখে সব শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শত্রুঘ্ন। মধুপুরী রাজ্যটিকে দু ভাগে ভাগ করলেন তিনি; এক ভাগের নাম হল: মধুরা, অন্যটির বৈদিশপুরী। দুই ছেলে শত্রুঘ্নের—সুবাহু ও শত্রুঘাতী। শত্রুঘ্ন মধুরা-রাজ্য দিলেন সুবাহুকে, আর শত্রুঘাতীকে দিলেন বৈদিশপুরী। তারপর কালবিলম্ব না করে তিনি এসে পৌঁছলেন অযোধ্যায়।

এবার মহাপ্রস্থানের আয়োজন করলেন রাম। বিভীষণ ও হনুমানকে তিনি বর দিলেন যে, তারা অমর হবে; আর জাম্ববান মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বললেন যে, তারা কলিকাল পর্যন্ত জীবিত থাকবে।

পরদিন প্রভাতে ভরত ও শত্রুঘ্নকে নিয়ে সরযূ-নদীতে দেহত্যাগ করতে চললেন রাম। সর্বাগ্রে চললেন কুলপুরোহিত মহামুনি বশিষ্ঠ, তারপর ভাইদের নিয়ে রাম, তারপর দলে দলে অযোধ্যার লোক এবং বানর ও ভল্লুক।

ভাইদের নিয়ে রাম সরযূর জলে অবতরণ করার উপক্রম করতেই স্বয়ং ব্রহ্মা এসে অভ্যর্থনা করে বললেন: "এস, বিষ্ণু, ফিরে এস স্বর্গে!"

এমনি করে চার ভাই স্বর্গে ফিরে বিষ্ণুর শূন্য আসন পূর্ণ করলেন।

আর, যারা রামের সঙ্গে দেহত্যাগ করতে এসেছিল সরযূতে, সেই সব নরনারী বানর এবং ভল্লুকও গেল স্বর্গে!

* * *

এমনি করে রাবণের অত্যাচার থেকে পৃথিবীকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য মানবজন্ম গ্রহণ করেছিলেন ভগবান্ বিষ্ণু। রাবণবধ হল, পৃথিবীতে শান্তি এল ফিরে। তারপর সারা জীবন ধরে অকথ্য কষ্ট সহ্য করে জগতে মহত্ত্বের এক অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করলেন রামরূপী বিষ্ণু। তারপর আবার ফিরে গেলেন বিষ্ণুলোকে।

সমাপ্ত